বিদ্যাবাড়ি

44 তম BCS

লিখিত প্রস্তুতি

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

লেকচার শীট

www.biddabari.com

BCS লিখিত প্রস্তুতি

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা নং দেখে কাঙ্ক্ষিত লেকচার খুঁজে নিন

বিষয়	✓ পৃষ্ঠা নং
41st BCS Written Syllabus on International Affairs	৩৫৩
৪০তম বিসিএস লিখিত প্রশ্নাবলি	৩৫৪
৩৮তম বিসিএস লিখিত প্রশ্নাবলি	৩৫৫
৩৭তম বিসিএস লিখিত প্রশ্নাবলি	৩৫৬
লেকচার # ০১	৩৫৭
লেকচার # ০২	৩৭৭
লেকচার # ০৩	৪০৮
লেকচার # ০৪	৪২৭
লেকচার # ০৫	৪৫২
লেকচার # ০৬	৪৮১
লেকচার # ০৭	৫১১
লেকচার # ০৮	৫৪৪
লেকচার # ০৯	৫৭৭
লেকচার # ১০	৬১৪

44st BCS Written Syllabus on International Affairs

Distribution of Marks

1. Short Conceptual Notes	: 10 out of 12	10 × 4 = 40
2. Analytical Questions	: 3 out of 4 questions	3 × 15 = 45
3. Problem-solving question	: 1 out of 1	1 × 15 = 15

Section A: Conceptual Issues

Introduction to International Affairs: Significance of international affairs; meaning and scope of international affairs; linkage between international affairs and international politics

Actors in the World: Modern state, types of state, sovereignty, non-state actors, international institutions, relations between state and non-state actors

Power and Security: power, national power, balance of power, disarmament, arms control, geopolitics, terrorism

Major Ideas and Ideologies: Nationalism, imperialism, colonialism, neo-colonialism, post-modernism, globalization and new world order

Foreign policy and Diplomacy: concepts of foreign policy and diplomacy, decision-making process, determinants of foreign policy, diplomatic functions, immunities, and privileges

International Economic Relations: International trade, free trade, protectionism, foreign aid, debt crisis, foreign direct investment (FDI), financial liberalization, regionalism, regionalization, North-South gap, global poverty, MDGs

Global Environment: Environmental issues challenges, climate change, global warming, climate adaptation, climate diplomacy

Section B: Empirical Issues (Analytical Questions)

The United Nations System: The UN and its organs, importance and limitations of the UN, Reforms of the UN, Role of the Security Council, UN Peacekeeping and peace-building functions, Human rights agenda, Environmental agenda, International Court of Justice, and Women empowerment

Foreign Relations of Major Powers: USA, Russia, UK, China, France, Germany, India, Japan etc.

Global Initiatives and Institutions: World Bank, IMF, ADB, G8, G-77, WTO, Kyoto Protocol, COP etc.

Regional Institutions: SAARC, BIMSTEC, EU, ASEAN, NATO, APEC, OIC, AU, GCC

Major Issues and Conflicts in the World: The Palestine Problem, the Arab Spring, the Kashmir Issue, the Syrian Crisis, Persian Gulf Conflict, nuclear issue and Iran, the North Korean issue, territorial disputes in Southeast and East Asia, Nuclear proliferation and other contemporary issues.

Politics in South Asia: India-Pakistan relations, Bangladesh-India relations, regional integration, water dispute, border problems and terrorism

Bangladesh in International Affairs: Major achievements, challenges, future directions

Section C: Problem-solving

The candidates may be asked to come up with an analysis of a problem and its solution on any aspect of global developments and security issues, such as trade, climate change, foreign aid, arms proliferation etc.

৪০তম বিসিএস লিখিত প্রশ্নাবলি

১। **নিম্নলিখিত যে-কোনো দশটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন:** ৪ × ১০ = ৪০

(ক) জলবায়ু শরণার্থী (climate refugee) বলতে কী বোঝায়?

(খ) চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(গ) সুনীল অর্থনীতি (blue economy) সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(ঘ) আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের গতিপ্রকৃতি উল্লেখ করুন।

(ঙ) বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই) বলতে কী বোঝায়?

(চ) পররাষ্ট্রনীতিতে জনকূটনীতির গুরুত্ব কী? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

(ছ) ভঙ্গুর রাষ্ট্র (fragile state) ও ব্যর্থ রাষ্ট্র (failed state)-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

(জ) দক্ষিণ চীন সাগর বিরোধের কারণসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(ঝ) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(ঞ) সিডা (CEDAW)-র গুরুত্ব সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করুন।

(ট) ট্র্যান্সআটলান্টিক (transatlantic) সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(ঠ) আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে ফাংশনালিজম (functionalism) তত্ত্বের গুরুত্ব কী?

২। **যে-কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিন:** ১৫ × ৩ = ৪৫

(ক) যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যকার চলমান বাণিজ্য যুদ্ধ আন্তর্জাতিক বাজারে ও বিশ্ব অর্থনীতিতে কী ধরনের প্রভাব ফেলছে বিস্তারিত লিখুন।

(খ) দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তার হুমকিসমূহ ব্যাখ্যা করুন। এ অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আপনার সুপারিশসমূহ কী কী?

(গ) মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে ইরান ও সৌদি আরবের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলাফল বিশ্লেষণ করুন। এ অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।

(ঘ) অর্থনৈতিক কূটনীতি কী? বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে অর্থনৈতিক কূটনীতির গুরুত্ব আলোচনা করুন। অর্থনৈতিক কূটনীতি শক্তিশালী করার জন্য বাংলাদেশ কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে?

৩। রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় বাংলাদেশের গৃহীত নীতি ও পদক্ষেপ সারা বিশ্বে প্রশংসিত হচ্ছে এবং দেশের জন্য অনেক সুফল বয়ে আনছে। কিন্তু মিয়ানমার সরকারের আচরণের কোন পরিবর্তন ঘটছে না। রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে কোন কার্যকর ভূমিকা রাখছে না। এ পরিস্থিতিতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে রোহিঙ্গা বিষয়ে একটি উন্মুক্ত আলোচনায় বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই আলোচনায় অংশ নেবেন। এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের জন্য একটি নীতিপত্র (policy brief) তৈরি করুন। ১৫

৩৮তম বিসিএস লিখিত প্রশ্নাবলি

১। **নিম্নলিখিত যে কোন দশটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন।** **৪×১০ = ৪০**

ক) বহুজাতিক রাষ্ট্র বলতে কি বুঝায়?

খ) মানব নিরাপত্তার প্রধান উপাদানসমূহ কি কি?

গ) গণতান্ত্রিক শান্তি তত্ত্বের (Democratic Peace Theory) মূল বক্তব্য কি?

ঘ) মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলতে কি বুঝায়? উদাহরণ দিন।

ঙ) 'ভূ-খণ্ড' এবং 'ভূ-খণ্ডগত অখণ্ডতা'র মধ্যে পার্থক্য কি?

চ) উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্যসমূহ সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

ছ) বৈশ্বিক সম্পদের (Global Commons) ধারণাটি কি?

জ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সর্বাধিক পছন্দসই দেশ (Most Favoured Nation) বলতে কি বুঝায়?

ঝ) অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক হুমকির মধ্যে পার্থক্য কি?

ঞ) আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অরাষ্ট্রীয় কর্মক (Non-State Actors) বলতে কি বুঝায়? উদাহরণসহ লিখুন।

ট) জাতিসংঘের অধীনে শান্তিরক্ষা বলতে কি বুঝায়?

ঠ) আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তি বলতে কি বুঝায়?

২। **যে কোন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিন।** **১৫×৩ = ৪৫**

ক) (i) বালাদেশ-মিয়ানমার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি চিহ্নিত করুন। ৫

(ii) রোহিঙ্গা ইস্যুকে আপনি কি 'জাতীয় নিরাপত্তার সংকট না মানবতার সংকট হিসেবে বিবেচনা করেন? আপনার বিবেচনায় এ সংকট মোকাবেলা করার কৌশল ও পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করুন। ১০

খ) (i) সিরিয়া যুদ্ধে রাশিয়ার সম্পৃক্ততার ফলে যুদ্ধের সম্ভাব্য পরিণতিতে কি ধরণের পরিবর্তন ঘটেছে বলে আপনি মনে করেন? ১০

(ii) সিরিয়া সংকটের ভবিষ্যৎ কি? ৫

গ) অভিবাসন ও উন্নয়নের মধ্যকার সম্পর্ক চিহ্নত করুন। সমসাময়িক বিশ্বব্যবস্থায় এ সম্পর্ককে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন? বিস্তারিত লিখুন। ১৫

(ঘ) (i) বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থানের সমস্যা ও সম্ভাবনাসমূহ কি কি? ৬

(ii) দক্ষিণ এশিয়ার পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ভূকৌশলগত গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন। ৯

৩। মিয়ানমার এবং ভারতের সঙ্গে সমুদ্র সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তির ফলে বঙ্গোপসাগরে ব্যাপক অঞ্চল বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের অধীন। এই এলাকায় শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের জন্য একটি নীতিপত্র (Policy Brieft) তৈরি করুন।

৩৭তম বিসিএস লিখিত প্রশ্নাবলি

০১. **নিম্নলিখিত যে কোনো দশটি বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন :** **৪ × ১০ = ৪০**

ক. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য কি?

খ. রাষ্ট্র গঠনের উপাদান হিসাবে সার্বভৌমত্বের গুরুত্ব কি?

গ. পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়নের বহি: উপদানগুলি কি?

ঘ. বাংলাদেশ, ভারত, ভুটান, নেপাল আন্ত:দেশীয় সড়ক যোগাযোগের কাঠামো কি?

ঙ. আঞ্চলিক ও আঞ্চলিকীকরণের পার্থক্য কি?

চ. আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন অনুযায়ী (Exclusive Economic Zone) বিশেষায়িত অর্থনৈতিক এলাকা বলতে কি বোঝায়?

ছ. দ্বৈত ট্র্যাক (Dual Track) কূটনীতি কি?

জ. Soft Power (শক্তি) বলতে কি বুঝায়?

ঝ. সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (Millennium Development Goal) এবং ধারণযোগ্য উন্নয়ন লক্ষ্য (Sustainable Development) বিষয়ে ধারণা দিন (সংক্ষেপে)।

ঞ. কপ-২২ (Cop-22) মূল সিদ্ধান্তগুলি কী কী?

০২. **যে কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিন :** **১৫ × ৩ = ৪৫**

ক. এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (ADB) পরিচালনা পদ্ধতি সমালোচনামূলক ভাবে পর্যালোচনা করুন। সম্প্রীতি চীন কর্তৃক প্রস্তাবকৃত ও ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (AIIB) গঠনের মাধ্যমে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের কার্যক্রম কি ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে? AIIB গঠনের প্রেক্ষিতের আলোকে আলোচনা করুন।

খ. ইরানের পারমাণবিক শক্তি অর্জনের প্রচেষ্টার প্রেক্ষিত ও বর্তমান অবস্থা আলোচনা করুন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অপর কয়েকটি দেশের সাথে ২০১৬ সম্পাদিত চুক্তি ইরানের পারমাণবিক পরিকল্পনার কি প্রভাব ফেলবে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নব নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ক্ষমতা গ্রহণের আলোকে ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের ভবিষ্যৎ কি হতে পারে?

গ. চীন ও ভারতের সম্পর্ক নিয়ে একটি রচনা লিখুন। এই দুটি রাষ্ট্রের সম্পর্কের গতি প্রকৃতি এশিয়ার বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায় কি প্রভাব রাখছে তা পর্যালোচনা করুন।

ঘ. দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে সার্কের বর্তমান অবস্থা কি? ভবিষ্যতে শক্তিশালী ভূমিকা রাখার জন্য সার্কের (Charter) চার্টার-এ পরিবর্তন আনা কি প্রয়োজন? কি ধরণের পরিবর্তন আনা কি প্রয়োজন? কি ধরণের পরিবর্তন সার্কের ভূমিকাকে কার্যকরী করবে? মতামতের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

০৩. ১৯৭১ সনের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বাংলাদেশের ও পাকিস্তানের বেশ কিছু অমীমাংসাকৃত সমস্যা রয়েগেছে। এর মধ্যে একটি হলো সম্পদ (Assets) ও অন্যটি হলো ধার দেনা (Liability) সংক্রান্ত। সম্প্রতি পাকিস্তান এই বিষয়ে কিছু মতামত প্রকাশ করেছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা হিসেবে এই সমস্যাটি নিরসনে কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে তা আলোচনা করুন।

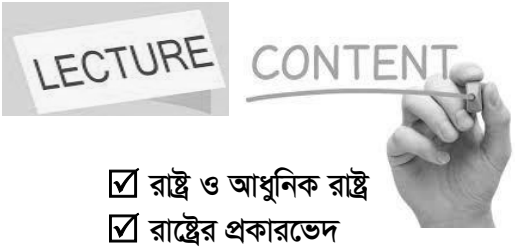

- ☑ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক
- ☑ আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির তাৎপর্য
- ☑ আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির পরিধি ও বিষয়বস্তু
- ☑ আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে সম্পর্ক
- ☑ রাষ্ট্র ও আধুনিক রাষ্ট্র
- ☑ রাষ্ট্রের প্রকারভেদ
- ☑ সার্বভৌমত্ব
- ☑ অ-রাষ্ট্রীয় কর্মক
- ☑ রাষ্ট্রীয় ও অ-রাষ্ট্রীয় কর্মকের মধ্যকার সম্পর্ক

Syllabus on International Affairs

Section A: Conceptual Issues

- ☑ **Introduction to International Affairs:** Significance of international affairs; meaning and scope of international affairs; linkage between international affairs and international politics
- ☑ **Actors in the World:** Modern state, types of state, sovereignty, non-state actors, international institutions, relations between state and non-state actors.

BCS প্রশ্নাবলী | আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও রাজনীতি

- ⇨ পররাষ্ট্রনীতিতে জনকূটনীতির গুরুত্ব কী? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন। *(৪০তম বিসিএস)*
- ⇨ ভঙ্গুর রাষ্ট্র (fragile state) ও ব্যর্থ রাষ্ট্র (failed state)-এর মধ্যে পার্থক্য কী? *(৪০তম বিসিএস)*
- ⇨ বহুজাতিক রাষ্ট্র বলতে কি বুঝায়? *(৩৮তম বিসিএস)*
- ⇨ 'ভূ-খণ্ড' এবং 'ভূ-খণ্ডগত অখণ্ডতা'র মধ্যে পার্থক্য কি? *(৩৮তম বিসিএস)*
- ⇨ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অরাষ্ট্রীয় কর্মক (Non-State Actors) বলতে কি বুঝায়? উদাহরণসহ লিখুন। *(৩৮তম বিসিএস)*
- ⇨ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তি বলতে কি বুঝায়? *(৩৮তম বিসিএস)*
- ⇨ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য কি? *(৩৭তম বিসিএস)*
- ⇨ রাষ্ট্র গঠনের উপাদান হিসাবে সার্বভৌমত্বের গুরুত্ব কি? *(৩৭তম বিসিএস)*
- ⇨ আঞ্চলিক ও আঞ্চলিকীকরণের পার্থক্য কি? *(৩৭তম বিসিএস)*
- ⇨ জাতিতাত্ত্বিক রাষ্ট্র বলতে কি বোঝায়? *(৩৬তম বিসিএস)*
- ⇨ সরকার ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য কী ? *(৩৬তম বিসিএস)*
- ⇨ সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী? *(৩৬তম বিসিএস)*
- ⇨ জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র (Nation-State) বলতে কী বোঝায়? *(৩৫তম বিসিএস)*
- ⇨ অপ্রচলিত নিরাপত্তা বলতে কী বুঝায়? *(৩৫তম বিসিএস)*
- ⇨ সার্বভৌমত্ব (Sovereignty) ও সার্বভৌম সমতার মধ্যে তফাৎ কি? *(৩৫তম বিসিএস)*

যেভাবে প্রশ্ন হতে পারে

১. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি কলতে কী বোঝায়?
২. সরকার ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য কী ?
৩. রাষ্ট্র গঠনের উপাদান হিসাবে সার্বভৌমত্বের গুরুত্ব কি?
৪. রাষ্ট্রের ভূখণ্ড অর্জনের ধরণসমূহ উল্লেখ করুন।
৫. ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার কৌশল কিভাবে নির্ধারিত হয়?
৬. কমনওয়েলথ-এর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক নিরূপণ করুন।
৭. অ-রাষ্ট্রীয় কর্মক (Non State Actor) বলতে কী বোঝায়?
৮. রাষ্ট্রীয় এবং অ-রাষ্ট্রীয় কর্মকের (State & Non State Actor) এর মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করুন।
৯. ব্রিকস ব্যাংক (NDB) গঠনের ইতিহাস উল্লেখ পূর্বক AIIB ব্যাংকের সাথে NDB ব্যাংকের পার্থক্য নিরূপণ করুন।
১০. আসিয়ানভূক্ত দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কেও একটি চিত্র তুলে ধরুন।

CLASS WORK Meaning & Scope of International Affairs

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গতিশীল এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল পাঠ্যসূচিরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। আন্তর্জাতিক সমাজ থেকেই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচ্য-সূচির উপকরণ সংগৃহীত হয়। বিগত সত্তর বছর ধরে আন্তর্জাতিক সমাজের অভাবনীয় পরিবর্তন আন্ত:রাষ্ট্রীয় সম্পর্ককে বিপুলভাবে পরিবর্তিত করেছে। একটি স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন পাঠ্যসূচি হিসাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ত্রিশের দশক থেকে আন্তর্জাতিক সমাজের ঐ পরিবর্তনশীল প্রকৃতির ধারা অনুসরণ করেছে। এই কারণে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচ্য বিষয় বা বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোনো স্থায়ী সীমা বেঁধে দেওয়া সম্ভব নয়।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এই গতিশীল প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে জনৈক বিশ্লেষক মন্তব্য করেছেন, সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পুনর্গঠনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলেছে। এর ফলে পুরনো জাতীয় রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র-ব্যবস্থা নতুন রাজনৈতিক রূপ লাভ করেছে। উপনিবেশিক সাম্রাজ্য ভেঙে যাবার ফলে বহু দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। জাতীয় রাষ্ট্রসমূহ বৃহদায়তন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। জাতীয় অর্থনীতির পুনর্বিন্যাস সাধিত হচ্ছে। অপ্রতিরোধ্য সার্বভৌম ক্ষমতার অন্তরালে জাতীয় রাষ্ট্রসমূহ আঞ্চলিক গোষ্ঠী গড়ে তুলতে বাধ্য হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচ্য বিষয় ব্যাপক ও পরিবর্তনশীল। কোনো কোনো লেখক যুদ্ধ, আন্তর্জাতিক সম্মেলন, বাণিজ্য, কুটনীতি, বৈদেশিক সাহায্য এবং এমন কি বিমান ছিনতাইকেও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে যে-সব বিষয় আন্তর্জাতিক সমাজের ক্রিয়াকলাপ, প্রতিক্রিয়া এবং পুন:ক্রিয়া সৃষ্টি করে সে-সব বিষয় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত।

গ্রেসন কার্ক (Grayson Kirk) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন : ১. রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রকৃতি ও পরিচালনা; ২. রাষ্ট্রের ক্ষমতার উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ; ৩. বৃহৎ শক্তিসমূহের অবস্থান এবং তাদের বৈদেশিক নীতি; ৪. সাম্প্রতিক কালের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক; ৫. একটি স্থায়ী বিশ্ব-ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

ভিনসেন্ট বেকারের (Vincent Baker) সমীক্ষা অনুসারে সাতটি বিষয় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত। এই সাতটি বিষয় হলো :

১. আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রকৃতি এবং প্রধান শক্তিসমূহ; ২. আন্তর্জাতিক জীবনের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সংগঠন; ৩. জাতীয় ক্ষমতার উপাদানসমূহ; ৪. জাতীয় স্বার্থ প্রসারের মাধ্যমসমূহ; ৫. জাতীয় ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা ও নিয়ন্ত্রণ; ৬. এক বা একাধিক বৃহৎ শক্তি এবং মাঝে মাঝে কোনো ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি; ৭. সাম্প্রতিক কালের আন্তর্জাতিক ঘটনাবলির ইতিহাস এবং অন্যান্য উপাদানের পটভূমিকা হিসাবে ঐতিহাসিক উপাদানসমূহ।

১৯৪৮ সালে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিষদের প্যারিস সম্মেলনে তিনটি বিষয়কে আন্তজাতিক সম্পর্কের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ঐ তিনটি বিষয় হলো আন্তর্জাতিক রাজনীতি- i. আন্তর্জাতিক সংগঠন ও প্রশাসন এবং ii. আন্তর্জাতিক আইন।

কুইনসি রাইট (Quincy Wright) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে আটটি বিষয় যুক্ত করেছেন। ঐ বিষয়সমূহ হলো- আন্তর্জাতিক আইন, কূটনীতির ইতিহাস, সামরিক বিজ্ঞান বা যুদ্ধের কলাকৌশল, আন্তর্জাতিক রাজনীতি, সংগঠন, বাণিজ্য উপনিবেশিক সরকার এবং পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ। ১৯৪৫ সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পাঠ্যসূচিরূপে আন্তর্জাতিক রাজনীতি, আইন, সংগঠন, ইউরোপীয় কূটনীতির মৌল বৈশিষ্ট্য ও সমস্যা, মার্কিন কূটনীতির বৈশিষ্ট্য ও সমস্যা, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পর্যালোচনা, রাজনীতির অর্থনৈতিক ভিত্তি ও রাজনীতির ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এবং আধুনিক রাজনৈতিক তত্ত্বকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

জর্জ মডেলস্কীর (George Modelski) মতে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যুদ্ধ এবং শান্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক আচরণের সঙ্গে জড়িত। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্পর্ক আলোচনা করে। আন্তর্জাতিক সংগঠনও তার আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

যোসেফ ফ্রাঙ্কেলের মতে, আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিষয়বস্তু বহু ব্যাপক। আন্তর্জাতিক রাজনীতি সকল দেশের পররাষ্ট্রনীতি, তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, সামগ্রিকভাবে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নীতির সম্পর্কও এখানে আলোচিত হয়। তিনি আন্তর্জাতিক সমাজের কাঠামো, রাষ্ট্র-ব্যবস্থার উদ্ভব, অ-রাষ্ট্রীয় সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী, পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে জাতীয় স্বার্থ-সহ বিভিন্ন ধারণা ও সংস্থা এবং সংগঠনের ভূমিকা, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ, প্রতিযোগিতা এবং সহযোগিতা, জাতীয় ক্ষমতা, কূটনীতি, প্রচারকার্য এবং অর্থনৈতিক হাতিয়ার-সহ রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া প্রকাশের বিভিন্ন মাধ্যম ও কৌশল, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠান, সমাজের সংস্থাসমূহের আলোচনাকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

পামার এবং পারকিন্‌স্ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, জাতীয় ক্ষমতা, কূটনীতি, প্রচারকার্য, জাতীয় নীতি প্রয়োগের অর্থনৈতিক মাধ্যমসমূহ, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশিকতাবাদ, যুদ্ধ, শক্তিসাম্য, যৌথ নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক আইন, সংগঠন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিশ্ব-পরিস্থিতি, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচ্যসূচিরূপে চিহ্নিত করেছেন। তাঁদের মতে, উত্তরণীল বিশ্ব-সমাজই হলো আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়বস্তু।

সিসিল ভি. ক্র্যাব (Cecil. V. Crabb)-এর মতে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়বস্তু হলো, রাষ্ট্রের লক্ষ্য এবং নীতি নির্ধারণের প্রক্রিয়ার উপর ক্রিয়াশীল প্রভাব ও উপাদানসমূহ; নীতি নির্ধারণ ও প্রয়োগের কৌশল এবং কাঠামো; রাষ্ট্রসমূহের বিরোধ নিষ্পত্তির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন পদ্ধতি, ব্যবস্থা এবং প্রতিষ্ঠান; বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা এবং সম-উদ্দেশ্যে সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতি, ব্যবস্থা এবং প্রতিষ্ঠান ও তাদের লক্ষ্য সাধনের জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রকৃতি এবং বিষয়বস্তু আলোচনা প্রসঙ্গে ফ্রেডারিক এস. ডান (Frederic S. Dunn) পনেরটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর মতে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্পর্ক, রাজনৈতিক বিষয় এবং ঘটনা সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য, রাজনৈতিক গোষ্ঠী অথবা ব্যক্তির আচরণ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান, বিশ্ব-ব্যবস্থায় বিভিন্ন স্বাধিকারসম্পন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীসমূহের সম্পর্ক, জাতীয় নীতির বিরোধ, সামঞ্জস্যবিধান এবং মতৈক্য, জাতীয় শক্তি, অর্থনৈতিক আদান-প্রদান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

অধ্যাপক বার্টনের মতে, বর্তমান পর্যায়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক একদিকে সংকীর্ণ এবং আর একদিকে ব্যাপকতর হয়ে উঠছে। সংকীর্ণ অর্থে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আন্ত:রাষ্ট্র সম্পর্কের অনেক বিষয়কে তার আলোচ্য বিষয় থেকে বাদ দিচ্ছে। এই সব বিষয় নিয়ে বর্তমানে প্রতিষ্ঠান, নিরস্ত্রীকরণ এবং সমরবিদ্যা-বিষয়ক বিশেষজ্ঞগণ আলোচনা করছেন। ব্যাপক অর্থে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, আচরণগত সংবেদনশীলতা, পরিবর্তনের দাবি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উপর লিখিত স্বীকৃত উচ্চমানের পাঠ্যপুস্তকে পূর্বে এসব বিষয় সংযোজিত ছিল না। অন্যান্য দেশের সঙ্গে জড়িত সকল জাতীয় নীতিও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত। আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি ব্যাখ্যা করে এবং ঐ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিষয়ে তত্ত্ব গঠনে উদ্যোগ গ্রহণ করে। হার্টম্যানের (Hartmain) মতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এমন একটি পাঠ্যবিষয় যা এক রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের সামঞ্জস্য বিধানের প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে।

অধ্যাপক বার্টনের মতে, সাম্প্রতিককালে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিকাশের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো- জোট, যৌথ নিরাপত্তা এবং ক্ষমতা প্রয়োগ-সম্পর্কিত ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যুদ্ধহীন পরিস্থিতির পরিবর্তে সে বর্তমানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত প্রক্রিয়া নিয়েও আলোচনা করছে।

কুইনসি রাইট "The Study of International Relations" গ্রন্থে জাতি, রাষ্ট্র, সরকার, জনসাধারণ, অঞ্চল, জোট, কনফেডারেশন, আন্তর্জাতিক সংগঠন, এমন কি শিল্পসংগঠন, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় সংস্থা-সহ বিভিন্ন ধরণের গোষ্ঠীকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

হ্যাসন জে. মরগেনথাউ আন্তর্জাতিক রাজনীতির তত্ত্ব এবং প্রয়োগ, ক্ষমতা, সাম্রাজ্যবাদ, কূটনীতি, রাজনৈতিক মতাদর্শ, শক্তিসাম্য, আন্তর্জাতিক নৈতিকতা; বিশ্ব-জনমত, আন্তর্জাতিক আইন, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব, বিংশ শতকের মধ্যবর্তী বিশ্ব-রাজনীতি, আন্তর্জাতিক সংগঠন, শান্তির সমস্যা ইত্যাদি বিষয়কে আন্ত:রাষ্ট্রীয় রাজনীতির প্রতিপাদ্য বিষয়রূপে গ্রহণ করেছে।

CLASS WORK Significance of International Affairs

স্বতন্ত্র পাঠ্য বিষয়রূপে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বর্তমানে সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কোনো সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নেই। বিশেষজ্ঞগণ নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে এই আলোচ্য বিষয়ের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। সেই কারণেই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সংজ্ঞা সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদের অবকাশ রয়েছে। উপরন্তু, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সংজ্ঞা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে আর একটি সমস্যা আছে। অনেক সময়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে 'বিশ্ব-রাজনীতি', 'আন্তর্জাতিক রাজনীতি'র সমার্থক বিষয়রূপে গণ্য করা হয়।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বিষয়টিকে 'রাষ্ট্রসমূহের সম্পর্ক'- বিষয়ক আলোচ্য-সূচি নামে অভিহিত করেছেন। আবার অনেকে এই বিষয়কে ক্ষমতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন।

পামার এবং পারকিন্‌স্-এর মতে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্ব-সমাজের সকল মানুষ ও গোষ্ঠীর সকল সম্পর্ক, মানুষের জীবন, ক্রিয়াকলাপ ও চিন্তার প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি, চাপ এবং প্রক্রিয়া আলোচনা করে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় রাজনৈতিক এবং অ-রাজনৈতিক বিষয় যুক্ত থাকে। কে. জে. হলস্‌টি-র মতে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে সাধারণভাবে নিয়মিত প্রক্রিয়া অনুসারে পরস্পরের উপর ক্রিয়াশীল স্বাধীন রাজনৈতিক সত্তা অর্থাৎ রাষ্ট্রসমষ্টি নিয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার পর্যালোচনাকেই বোঝায়।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সংজ্ঞা আলোচনা প্রসঙ্গে স্লানলি এইচ. হফ্‌ম্যান উল্লেখ করেছেন যে, আলোচ্য বিষয়রূপে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সুষ্ঠু ও সুঠাম রূপ ধারণ করেনি। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সংজ্ঞা সম্পর্কে ব্যাপক মতৈক্য আছে। তাঁর মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ন্যায় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সাম্প্রতিক সংজ্ঞাকে কেন্দ্র করেও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এই কারণেই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রচলিত সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা আলোচনার পর তিনি নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন।

হফম্যান আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে রাষ্ট্রসমূহের সম্পর্ক নামে গ্রহণ করেননি। কারণ রাষ্ট্র যে-কোনো একক সত্তাসম্পন্ন নয়। রাষ্ট্রের মধ্যে এবং রাষ্ট্রের পাশাপাশি ব্যক্তি, মতাদর্শ অথবা স্বার্থন্বেষী গোষ্ঠী প্রকৃত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর ভূমিকা পালন করে। আবার অনেকে ক্ষমতার মধ্যে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মনাদণ্ডের সন্ধান করেন। এই মতের প্রবক্তাগণ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে রাষ্ট্রসমূহের ক্ষমতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্পর্ককে বোঝান। হফ্‌ম্যান মনে করেন, কোনো নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপ রাষ্ট্রের ক্ষমতার সঙ্গে জড়িত কিনা, এই সংজ্ঞার মাধ্যমে তা স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়।

হফ্‌ম্যান আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি কার্যকর সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এমন উপাদান এবং কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত যা রাষ্ট্রের বাহ্যিক নীতি ও শক্তিকে প্রভাবিত করে।

প্যাডেলফোর্ড এবং লিঙ্কনের মতে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচ্য বিষয় ব্যক্তি, ব্যবসায়ী সংস্থা, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের আলোচনার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু সাধারণভাবে মানুষ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে কেবল বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্পর্ককেই বোঝেন। কারণ রাষ্ট্রশক্তিই শান্তি এবং যুদ্ধ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সরকারই ব্যবসা-বাণিজ্য, ভ্রমণ, সম্পদের ব্যবহার রাজনৈতিক ভাবধারা, ভূখণ্ডগত এখতিয়ার, জাতি-সত্ত্বা, সংযোগসাধন, সামরিক বাহিনী নিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর অন্যান্য দিক নিয়ন্ত্রণের জন্য কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে। এই কারণে স্বাভাবিকভাবে প্রত্যাশিত যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক হলো আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক।

প্যাডেলফোর্ড ও লিঙ্কন রাষ্ট্রসমূহের সম্পর্ককে 'আন্তর্জাতিক রাজনীতি' বা রাষ্ট্রীয় নীতির পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ারূপে অভিহিত করেছেন। এটাই হলো সাম্প্রতিককালের আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূল বিষয়।

হ্যারি এইচ. র‍্যানসম আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ৬ টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন : i. নির্দিষ্ট আলোচ্য-সূচি; ii. বিশ্লেষণের কাঠামো সম্পর্কে মতৈক্য; iii. আন্তর্জাতিক আচরণের বিশ্লেষণের জন্য চমকপ্রদ ধারণা প্রয়োগ; iv. স্বকীয় ভাষা; v. প্রাথমিক বিশ্লেষণলব্ধ ফলাফলের পুন:পরীক্ষার জন্য উন্নত মানের বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি; vi. গবেষণা এবং তার ফলাফলের তালিকা প্রণয়ন, মূল্যায়ন এবং তা সরবরাহের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা।

জন হাউস্টন-এর মতে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে আন্তর্জাতিক সম্মেলন, কূটনীতিবিদদের আগমন ও নির্গমন, চুক্তি সম্পাদন, সেনাবাহিনী নিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অবাধ প্রসার-সহ বিশাল এবং বৈচিত্র্যসমৃদ্ধ বিষয়কে বোঝায়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সঙ্গে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান ভাবধারা এবং মতাদর্শও জড়িত। ঐ ভাবধারা এবং মতাদর্শের মাধ্যমে তাদের আনুগত্য প্রভাবিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়।

কেনেথ ডব্লিউ. টমসন-এর মতে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিরোধ এবং যে সকল শর্ত ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের সম্পর্কের উন্নতি বা অবনতি ঘটে তাদের পর্যলোচনাকে বোঝায়। এফ. এস. ডান উল্লেখ করেছেন, জাতীয় সীমানার বাইরে প্রকৃত সম্পর্ককে অথবা কোনো নির্দিষ্ট সময়ে ঐ সম্পর্কের বিষয়লব্ধ জ্ঞানকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলে। প্রকৃতপক্ষে ডান আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে আন্তঃ রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক কে বুঝিয়েছেন।

কুইনসি রাইট উল্লেখ করেছেন, স্পষ্টভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক হলো অনিশ্চিত সার্বভৌমত্বযুক্ত বিভিন্ন সত্ত্বা বা রাষ্ট্রের সম্পর্ক। পর্যালোচনার বিষয়রূপে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কোনো আইনানুগ কাঠামোর দ্বারা সীমিত নয়। তবে আইনানুগ কাঠামোই এক সময়ে ঠিক করতে পারে কোন্ রাষ্ট্র সার্বভৌম এবং কোন্ রাষ্ট্র সার্বভৌম নয়।

উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে উল্লেখ করা যায় যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে এমন একটি আলোচ্য বিষয়কে বোঝায় যা বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কিত বহুমুখী এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এই অর্থে রাজনৈতিক মতাদর্শ, ক্ষমতা, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশের ধরণ, অ-রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সংগঠন যুদ্ধ ও শান্তি, নিরস্ত্রীকরণ, জাতিসত্ত্বা, জোট গঠন, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী থেকে প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক হলো একটি ব্যাপক পাঠ্য বিষয়।

বহু বিশেষজ্ঞ আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তুলনায় বেশি গুরুত্ব দান করেন। অনেকের মতে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি হলো বিশ্ব-পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক শক্তির অধীনস্থ বিষয়।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে ধারণায় বিশ্বাসী লেখকগণ এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, আন্তর্জাতিক রাজনীতির তুলনায় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এখতিয়ার বহু ব্যাপক। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ছাড়াও অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং মানবিক সম্পর্কও বিশ্লেষণ করে। পক্ষান্তরে, আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিষয়বস্তু অত্যন্ত সীমিত। আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষমতার খেলার সঙ্গে যুক্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। সাধারণভাবে, 'রাজনীতি' শব্দটির সঙ্গে বিরোধ বা সংঘর্ষের ধারণা জড়িত। 'সম্পর্ক' শব্দটি সাধারণভাবে সহযোগিতা এবং সমন্বয়ের পরিস্থিতি-দোত্যক।

সেলেইচার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং রাজনীতিকে ভিন্নতর পাঠ্যসূচিরূপে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, আন্তর্জাতিক সমাজে ক্ষমতা প্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধহীনতার দৃষ্টান্ত নগণ্য। ক্ষমতা আন্তর্জাতিক সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আন্তর্জাতিক আচরণের ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক আচরণের তুলনায় বিরোধিতামূলক আচরণ প্রাধান্য অর্জন করেছে। বিরোধিতামূলক আচরণ প্রাধান্য অর্জন করেছে। বিরোধিতামূলক আচরণ, বিরোধ এবং রাজনীতির আবর্তে আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চে সহযোগিতামূলক আচরণ হারিয়ে যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি সমার্থক নয়।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে আন্ত:রাষ্ট্রীয় সম্পর্করূপে ব্যাখ্যা করা হলে 'রাষ্ট্র' শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করা হয়। 'রাষ্ট্র' বলতে কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো রাষ্ট্রকেই বোঝায় না, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংগঠন, সামরিক ও অর্থনৈতিক জোট প্রকৃতিকেও বোঝায়। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক রাজনীতি বলতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ককে বোঝায়।

গ্রেসন কার্কের মতে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি জাতীয় রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণকারী শক্তিসমূহের আলোচনা করে। কিভাবে পররাষ্ট্রনীতি প্রয়োগ করা হয় এবং পররাষ্ট্রনীতির কার্যকারিতার উপর সীমাবদ্ধতা আরোপকারী প্রভাবসমূহের আলোচনাও আন্তর্জাতিক রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত।

রবার্ট পারলেন আন্তর্জাতিক রাজনীতি বলতে রাজনীতির সেই সকল বিষয়কে বুঝিয়েছেন যা মতনৈক্য, প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বী দাবি এবং রাষ্ট্রের সম্পর্কের পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা থেকে উদ্ভুত ফলাফলের পর্যালোচনা করে।

সিসিল ভি. ক্র্যাব আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিষয়বস্তুরূপে সাতটি আলোচ্য-সূচির উল্লেখ করেছেন, কিভাবে রাষ্ট্রের লক্ষ্য নির্ধারিত হয়; রাষ্ট্র কিভাবে নিজের লক্ষ্য পূরণের পদ্ধতি এবং কর্মসূচি নির্ধারণ করে; রাষ্ট্র কিভাবে নিজের লক্ষ্য পূরণের পথের অন্তরায়সমূহ অপসারণ করে; নিজের লক্ষ্য পূরণের জন্য রাষ্ট্র কিভাবে অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা এবং বিরোধের সম্পর্ক স্থাপন করে; সমাজের লক্ষ্য পরিপূরণের চেষ্টার ক্ষেত্রে কিভাবে রাষ্ট্রের ভূমিকা পরিবর্তিত হয়।

স্ট্রাউজ-হূপ এবং পাসোনীর মতে, আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিজ্ঞান রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক পর্যালোচনা করে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির অংশরূপে এক বা একাধিক রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত আংশিক বা সামগ্রিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ে আলোচনা করে। এই পর্যালোচনা দুটি অনুমানের উপর নির্ভরশীল, ঐ সব সম্পর্ক এবং ক্রিয়াকলাপ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা যায়; ঐ সব সম্পর্ক এবং ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা, শ্রেণি-বিভাজন, বিশ্লেষণ এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করা সম্ভব।

স্ট্রাউজ-হূপ এবং পাসোনী মনে করেন, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে এমন একটি নিয়ন্ত্রিত ধরন গড়ে ওঠে, যে ধরনকে পরীক্ষামূলক ভবিষ্যদ্বাণী রূপে প্রয়োগ করা যায়। এমন অনেক আন্ত:রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক আছে যা বিশেষভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং ঐ সম্পর্ক সাধারণভাবে লক্ষ্য করা যায় না। ঐ সম্পর্ককে ব্যক্তিগত ঘটনাবলি নামে ব্যাখ্যা করা যায়। পুন: পুন: সংঘটিত হয় না এমন ঘটনাবলির বিশ্লেষণরূপে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক একটি ঐতিহাসিক বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। মানবিক ক্রিয়া-কলাপের পর্যালোচনা রূপে আন্তর্জাতিক রাজনীতি হলো আন্তর্জাতিক মনস্তত্ত্বের অংশ।

'আন্তর্জাতিক রাজনীতি' এবং 'আন্তর্জাতিক সম্পর্কের' আলোচনা প্রসঙ্গে সি. এফ. অলজার মন্তব্য করেছেন, আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে সাধারণভাবে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করা হয়েছে। বহু লেখক আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে সমার্থক হিসাবে গণ্য করেন। বহু বিশেষজ্ঞ আবার আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে স্বতন্ত্র বিষয়রূপে গণ্য করে থাকেন। তাঁদের মতে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্পর্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, অর্থনীতি, আইন, যোগাযোগ-ব্যবস্থা, সংগঠন, বিশ্বযুদ্ধ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এলাকা গড়ে ওঠে। এরা প্রত্যেকেই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধীনস্থ বিষয় বা তার উপ-আলোচ্যসূচি।

মরগেনথাউ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিবর্তে আন্তর্জাতিক রাজনীতি শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে, একটি পাঠ্য-বিষয়রূপে আন্তর্জাতিক রাজনীতি সাম্প্রতিক ইতিহাস, বর্তমান ঘটনাবলি, আন্তর্জাতিক আইন অপেক্ষা স্বতন্ত্র বিষয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতি কেবল সাম্প্রতিক ইতিহাস এবং বর্তমান ঘটনাবলি নিয়েই আলোচনা করে না। আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে কেবল আইনগত বিধি ও প্রতিষ্ঠানেও রূপান্তরিত করা সম্ভব নয়।

যোসেফ ফ্রাঙ্কেল উল্লেখ করেছেন, এই শতকে রাষ্ট্রসমূহের সম্পর্কের বিষয় নিয়ে ক্রমবর্ধমান উৎসাহ জ্ঞানের একটি বিশেষজ্ঞ শাখার উদ্ভব ঘটিয়েছে। জেরেমি বেন্থাম বহু পূর্বেই এই বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক হিসাবে অভিহিত করেছেন। এই পাঠ্যবিষয় বিভিন্ন রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-সম্পর্কিত দিক এবং আন্তর্জাতিক ইতিহাস নিয়েই কেবল আলোচনা করে না, বরং সমগ্র আন্তর্জাতিক সমাজ, প্রতিষ্ঠান এবং প্রক্রিয়াসমূহ ও তার আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ককে বহু লেখক আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং বিশ্ব-রাজনীতির সমার্থক গণ্য করেন।

কে. জে. হলস্টির মতে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি বা বিশ্ব-রাজনীতির আলোচনাকে পররাষ্ট্রনীতি-সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। এই ধরনের আলোচনা স্বার্থ, ক্রিয়াকলাপ, বৃহৎ শক্তিসমূহের ক্ষমতার উপাদান ইত্যাদি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, বহু পর্যালোচক রাষ্ট্রের বাহ্যিক পরিবেশ এবং পরিস্থিতির ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচনা করেন। তাঁদের আলোচনা মূলত পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে। বহু লেখক পররাষ্ট্র-বিষয়ক কার্যকলাপকে অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া এবং সংবেদনশীলতার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা আন্তর্জাতিক রাজনীতি বলতে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ধরনকে বোঝেন।

যোসেফ ফ্রাঙ্কেলের মতে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তুলনায় বিশ্ব-রাজনীতি নামটি আরও যথার্থভাবে আন্তর্জাতিক সমাজের আলোচ্য-সূচি উপস্থাপন করতে পারে। হারবার্ট জে. স্পিরোর মতে, যে-সব লেখক ও বিশেষজ্ঞ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিবর্তে বিশ্ব-রাজনীতির ধারণার পক্ষে মত প্রকাশ করেন তাঁরা বিশ্ব-মানবসমাজের উদ্ভবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সচেষ্ট। ক্রমবর্ধমান হারে বিকশিত করিগরী বিদ্যা, যাতায়াত এবং সংযোগসাধন, আণবিক অস্ত্রের ভয়াবহতা বিশ্ব-মানবসমাজ গঠনের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ধারণা 'বিশ্ব-রাজনীতি' এবং 'আন্তর্জাতিক রাজনীতি'-র তুলনায় বহু ব্যাপক। বিশ্ব-রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি মূলত রাজনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রাজনৈতিক সম্পর্ক ছাড়াও অন্যান্য সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং বিশ্ব-রাজনীতির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সমাজের আংশিক পরিচয় পাওয়া যায়। তবে সাম্প্রতিক বিশ্বে রাজনৈতিক সম্পর্কের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

Difference between International Relations & International Politics

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হলেও তাদের মধ্যে কিছু পার্থক্য বিদ্যামান। নিম্নে তাদের পার্থক্য বিভিন্নভাবে আলোচনা করা হলো-

ক. **বিষয়বস্তুগত পার্থক্য :** আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় বিষয় ছাড়াও অরাষ্ট্রীয় সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করে। এটি রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের পাশাপাশি অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং মানবিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি শুধুমাত্র ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

খ. **সংজ্ঞাগত পার্থক্য :** যে সম্পর্ক বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে বহুমুখী ও বৈচিত্রপূর্ণ বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে তাই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। অন্যদিকে, জাতীয় স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে যে ব্যবহারিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাকেই আন্তর্জাতিক রাজনীতি বলে।

গ. **ব্যাপকতার পার্থক্য :** আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সরকার ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছাড়া সাধারণ জনগণের মাঝেও বিস্তৃত। অপরদিকে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি শুধুমাত্র সরকার ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মাঝে সীমাবদ্ধ।

ঘ. **উদ্দেশ্যগত পার্থক্য :** আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রধান উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা। অপরপক্ষে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করাই আন্তর্জাতিক রাজনীতির উদ্দেশ্য।

ঙ. **দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য :** আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সর্বদা শান্তির কথা বিবেচনা করে। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি অনেক সময় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ক্ষমতার লড়াইকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে।

চ. **গঠনগত পার্থক্য :** আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে বিশ্বের রাষ্ট্র ছাড়াও আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংগঠন, সামরিক ও অর্থনৈতিক জোট ইত্যাদির মধ্যে সম্পর্ক বোঝায়। অপরপক্ষে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি বলতে বিভিন্ন দেশের সরকার ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্ক স্থাপন বোঝায়।

ছ. **উৎপত্তিগত পার্থক্য :** আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অর্থনীতি, আইন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিভিন্ন দেশের সরকারের পররাষ্ট্রনীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।

জ. **কল্যাণের দিক থেকে পার্থক্য :** আন্তর্জাতিক সম্পর্ক মানব কল্যাণের নীতি মেনে চলে ও প্রণয়নের চেষ্টা করে। অপরপক্ষে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি সর্বদা নিজ রাষ্ট্রের কল্যাণে নীতি প্রণয়ন করে।

CLASS WORK State, Types of State

রাষ্ট্র

রাষ্ট্র একটি অত্যাবশ্যক সংগঠন। মানব সমাজের আদি সংগঠন পরিবার এর পরিবর্তন ও বিবর্তনের বিস্তৃত রূপ রাষ্ট্র নামক সংগঠন। রাষ্ট্র সমাজের একটি শক্তিশালী বাহন, যার মাধ্যমে সমাজ সঠিক ও সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। Woodrow Wilson এর মতে "A State is a people organized for law within a definite territory"। সুতরাং বলা যায়, যার রাজনৈতিক সংগঠনের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সুসংগঠিত সরকার, সার্বভৌম আধিপত্য এবং স্থানীয়ভাবে বসবাসকারী জনসমষ্টি রয়েছে, তাকে রাষ্ট্র বলে।

রাষ্ট্রের উপাদানসমূহ

রাষ্ট্র সম্পর্কিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের সংজ্ঞাসমূহ বিশ্লেষণ করলে রাষ্ট্রের ৪টি উপাদান দেখতে পাওয়া যায়। যেগুলো নিম্নরূপ :

১. **স্থায়ী জনগোষ্ঠী :** প্রত্যেক রাষ্ট্রের জন্য যৌক্তিক সংখ্যার জনগোষ্ঠী প্রয়োজন। যারা ঐ দেশের প্রতি পূর্ণ অনুগত থাকবে। এখানে কখনো ভাসমান জনসংখ্যা থাকতে পারবে না; অভিবাসী থাকতে পারবে, তবে তাদের এ দেশের প্রতি অনুগত্য প্রকাশ করতে হবে।

২. **ভূ-খণ্ড :** প্রত্যেক রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড থাকা বাঞ্ছনীয়। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কর্তৃক গ্রহণযোগ্য ভূ-খণ্ড বা সীমানা হলো নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড বলতে শুধু রাষ্ট্রের স্থলভাগকে বুঝায় না। স্থলভূমি, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরের নদ-নদী, রাষ্ট্রীয় সীমানায় সাগর-মহাসাগরের জলসীমা, স্থলভূমি-জলসীমার উপরিস্থিত আকাশসীমা এবং সকল প্রাকৃতিক সম্পদ রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ডের অন্তর্ভূক্ত। রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ড ভৌগোলিক দিক দিয়ে অখণ্ডিত বা দ্বি-খণ্ডিত হতে পারে। তবে রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ড বিচ্ছিন্ন না হয়ে সংযুক্ত হলেই ভাল।

৩. **সরকার :** রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ নিয়ে হচ্ছে সরকার যা সর্বময় ক্ষমতা পরিচালনা করে থাকে এবং রাষ্ট্রের উপর কার্যকারী ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। সরকার এর যে অপরিহার্য উপাদান তা পূরণকল্পে একটি সরকারকে অবশ্যই কার্যকারী বা Effective সরকার হতে হবে অর্থাৎ সরকারের কার্যকারিতা রয়েছে কিনা সেটাই মূল বিষয়। সরকারের রূপ বিভিন্ন হতে পারে। সরকারের রূপ মূখ্য বিষয় নয়। দেখা হয় সরকার কার্যকারী ও শক্তিশালী কি না।

৪. **সার্বভৌমত্ব :** সার্বভৌম ক্ষমতা হলো চরম ক্ষমতা যা অনমনীয়, অবিভাজ্য, একক ও অদ্বিতীয় । এ ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বে অবস্থান করে এবং অধীনস্থ সকলকে আদেশ ও নির্দেশ প্রদান করে থাকে। সার্বভৌমত্বের দুটো দিক আছে। প্রথমটি হলো অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব, যার বলে কোন রাষ্ট্র তার অধীন সকল জনসমষ্টি ও সংস্থার উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। দ্বিতীয় হলো বাহ্যিক সার্বভৌমত্ব, যার ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি রাষ্ট্র অন্য সকল রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব, নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকে। সুতরাং, সার্বভৌমত্ব ছাড়া কোন সংগঠন রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য হতে পারে না।

৫. **আন্তর্জাতিক স্বীকৃত :** আন্তর্জাতিক আইনে কোন সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে বিশ্বের অন্যান্য স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে মেনে নেওয়াকেই স্বীকৃত বলে। স্বীকৃতির ফলে কোন দেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে। স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠার ফলে একটি নব্য প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র কতিপয় অধিকার ভোগ করে থাকে। যেমন : অন্য রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার যোগ্যতা ইত্যাদি। সুতরাং, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি একটি রাষ্ট্রকে পরিপূর্ণভাবে একটি "কার্যকরী রাষ্ট্রের" মর্যাদা এনে দিতে পারে।

রাষ্ট্রের প্রকারভেদ

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা, অবস্থান ও ভূমিকার দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

ক. বাহ্যিক সার্বভৌমত্বের প্রেক্ষিতে;

খ. ক্ষমতার প্রেক্ষিতে;

গ. অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্বের প্রেক্ষিতে।

ক. বাহ্যিক সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে

১. **সামন্ত রাষ্ট্র :** এ রকম রাষ্ট্রগুলো অভ্যন্তরীণভাবে সবকাজ স্বাধীনভাবে করতে পারে কিন্তু শুধু পররাষ্ট্রের ক্ষেত্রে অভিভাবক রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় (যেমন: পূর্বেকার নেপাল এবং ভূটান। ভারত এক্ষেত্রে অভিভাবক রাষ্ট্র।)

২. **আশ্রিত রাষ্ট্র :** যদি কোন দুর্বল রাষ্ট্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য শক্তিশালী রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে আশ্রয় গ্রহণ করে তাকে আশ্রিত রাষ্ট্র বলে যেমন : তৎকালীন জম্মু-কাশ্মীর ছিল ভারতের আশ্রিত রাষ্ট্র)। অন্যদিকে, সিকিমকে ভারতের আশ্রিত রাষ্ট্র বলা হয়

৩. **আজ্ঞাধীন রাষ্ট্র :** একটি রাষ্ট্র যখন অন্য একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের অধীনে থাকে তখন তাকে আজ্ঞাধীন রাষ্ট্র বলে। সাধারণত যুদ্ধে পরাজিত রাষ্ট্রগুলোর এমন পরিণতি হয়।

৪. **অছি রাষ্ট্র :** ২য় বিশ্ব যুদ্ধের পর পরাধীন রাষ্ট্রকে স্বাধীনতার জন্য উৎসাহ দেয়া ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এসব রাষ্ট্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব UN-এর অছি পরিষদ পালন করতো উল্লেখ্য, সর্বশেষ পালাউ এর স্বাধীনতার পর UN-এর এ পরিষদের কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটেছে।

৫. **কনডোমিনিয়াম রাষ্ট্র :** যদি কোন রাষ্ট্রের উপর একের অধিক বহি:শক্তি যৌথভাবে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে, তখন তাকে যৌথ সার্বভৌম শাসিত রাষ্ট্র বা কনডোমিনিয়াম রাষ্ট্র বলে। যেমন : ব্রিটেন ও ফ্রান্স যৌথভাবে নিউ হেব্রাডাইস দ্বীপের উপর শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল।

৬. **ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র / অঞ্চল :** যে রাষ্ট্র সম্পূর্ণ বিদেশি শক্তির দখলে থাকে তাকে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র/অঞ্চল বলে। ভারতীয় উপমহাদেশ ব্রিটিশ কলোনীভূক্ত ছিল। অবশ্য ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর সকল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র উপনিবেশ থেকে মুক্ত হয়। কিন্তু বর্তমানে বৃহৎ শক্তি তার চেয়েও ক্ষতিকর এবং ভয়ঙ্কর উপনিবেশিক স্থাপন করছে তৃতীয় বিশ্বের উপর যেটা নব্য উপনিবেশবাদ বলে পরিচিত।

৭. **সমন্বিত যুক্তরাষ্ট্র**

i. **এক কেন্দ্রিক রাষ্ট্র :** একাধিক প্রদেশ যখন কেন্দ্রিয় সরকারের অধীনে থাকে তখন তাকে এক কেন্দ্রিক রাষ্ট্র বলে। যেমন : India।

ii. **ফেডারেশন :** আঞ্চলিক সরকার ও কেন্দ্রিয় সরকার যখন ক্ষমতা ভাগাভাগি করে রাষ্ট্র পরিচালনা করে তখন তাকে ফেডারেশন রাষ্ট্র বলে। যেমন: USA, German, UK

iii. **কনফেডারেশন :** যখন একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র স্ব-স্ব স্বার্থে তাদের ক্ষমতা বিশেষ ক্ষেত্রে শিথিল করে কেন্দ্রীয় বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন তাকে কনফেডারেশন রাষ্ট্র বলে। যেমন : ল্যাটিন আমেরিকা।

খ. **ক্ষমতার প্রেক্ষিতে**

১. **পরাশক্তি :** যখন কোন রাষ্ট্র অন্য কোন রাষ্ট্রকে পরোয়া করে না তথা আন্তর্জাতিক আইনের পরোয়া করে না তখন তাকে পরাশক্তি বলে।

২. **বৃহৎ শক্তি :** বৃহৎ শক্তি বলতে বিশ্বের গুটি কয়েক রাষ্ট্রকে বোঝানো হয় যাকে অন্যভাবে পরাশক্তি ও বলা হয়ে থাকে। এরা UNSC এর Veto ক্ষমতা সম্পন্ন রাষ্ট্রসমূহ। সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে এরা খুবই শক্তিশালী।

৩. **মাঝারি রাষ্ট্র :** মাঝারি রাষ্ট্র বলতে প্রধানত শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহকে বোঝানো হয়ে থাকে। যেমন, India, Japan, Germany। এরা ক্রম অগ্রসরমাণ রাষ্ট্র। এসকল রাষ্ট্র সামরিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি দিক থেকে ক্রমশ শক্তি অর্জন করতে থাকে এবং নিজের অবস্থান পরিবর্তন করতে চায়। মূলত বৃহৎ শক্তিগুলোর সাথে এসব রাষ্ট্রের দ্বন্দ্বের কারণ এটিই।

৪. **ক্ষুদ্র রাষ্ট্র :** যে সকর রাষ্ট্র কেবল নিজস্ব সামরিক শক্তির উপর ভিত্তি করে নিজেদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে না, বরং অন্য কোন রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান অথবা ভারসাম্য রক্ষা বলপ্রয়োগকারী অন্য কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার উপর নির্ভর করে তাকে ক্ষুদ্ররাষ্ট্র বলে। এরা স্বাধীনভাবে পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়ন করতে পারে না। এরা সাধারণত জোটগত অবস্থায় থাকতে পছন্দ করে। বৈশ্বিক অস্থিতিশীলতায় এরা বৃহৎ শক্তির পক্ষ অবলম্বন করে থাকে।

গ. **অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে :** অসম উন্নয়ন, অর্থনৈতিক অবনতি, রাষ্ট্রের অবৈধ কাজে সম্পৃক্ততা, রাষ্ট্রীয় নৈরাজ্য / বিশৃঙ্খলা ইত্যাদির উপর ভর করে রাষ্ট্রকে কতগুলো ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন:

১. **Failing State :** USA এর অদৃশ্য সরকার CIA ২০টি রাষ্ট্রকে Failing State বলছে।

২. **Fragile State :** যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা DFID ৪৬টি রাষ্ট্রকে Fragil State বলে অভিহিত করেছে।

৩. **Failed State :** Fund for peace ও Foreign policy এর গবেষকরা বিশ্বের ১০টি Failed State কে চিহ্নিত করেছে।

রাষ্ট্রের ভূখণ্ড অর্জনের ধরণসমূহ

রাষ্ট্রের ধরন সর্বদা পরিবর্তনশীল। সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ড ও সব সময় একই থাকবে এমন ও নয়, রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ডের সংকোচন, সম্প্রসারণ ঘটতে পারে। ভূ-খণ্ড অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি নিম্নে আলোচিত হলো :

ক. **দখল :** রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ড অর্জনের ক্ষেত্রে দখল একটি মৌলিক প্রথা। দখল পন্থায় রাষ্ট্র অধিকার বিহীন ভূ–খণ্ডে (Terra nullius) সার্বভৌমত্ব অর্জন করে, অর্থাৎ যে ভূ-খণ্ডে অন্য কোন রাষ্ট্র সার্বভৌমত্বের দাবিদার নয়, সে ভূ-খণ্ডে দখলদারীত্ব গ্রহণ করে। এমন ভূ-খণ্ড হতে পারে উন্মুক্ত সমুদ্রে নবগঠিত কোন দ্বীপ, কিংবা এমন ভূমি যা পূর্বে কোন রাষ্ট্রের অধীন ছিল না কিংবা থাকলেও পূর্ব রাষ্ট্র কর্তৃক সে অধিকার ত্যাগ করা হয়েছে। বিগত শতাব্দীতে এই পন্থাটি স্বীকৃত ছিল। দখলের মাধ্যমে ভূ-খণ্ড অর্জন ছিল গত শতাব্দীতেও বৈধ। কিন্তু একটি সাধারণ নীতি সব সময়ই ছিল যে দখলকৃত ভূমিটি যেন অন্য কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের অধীন না হয়।

খ. **রাজ্যজয় :** "সংযোজন" ভূ-খণ্ড অর্জনের আরেকটি অন্যতম পন্থা এবং পন্থাটি কেবল যুদ্ধের পরই গ্রহণ করা সম্ভব ছিল। সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে বিদেশি ভূমি বিজয় এবং নিজ ভূমির অন্তর্ভূক্ত করে নেওয়াকে সংযোজন বলা হয়। মূল কথা হচ্ছে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অন্যের ভূ-খণ্ড দখল করা এবং সেখানে সার্বভৌমত্ব কায়েম বা নিজ ভূ-খণ্ডভূক্ত করাই রাজ্য জয় বা সংযোজন পন্থায় ভূ-খণ্ড অর্জন। সাধারণত দু'ধরনের কার্যাবলির মাধ্যমে রাজ্যজয় হয়ে থাকে।

১. কোন ভূ-খণ্ড বিজয় করে তা নিজ ভূ-খণ্ডের অধীনে সংযোজন করা (যেমন : ইরাকের কুয়েত দখল করে প্রদেশ ঘোষণা করা)।

২. কোন এলাকার উপর হয়তো মোটামুটিভাবে কর্তৃত্ব আছে এমন এলাকাকে সংযোজিত এলাকা বলে ঘোষণা করা হয় (যেমন: কয়েক বছর জাপানের কর্তৃত্বাধীন থাকার পর ১৯১০ সালে জাপান কর্তৃক কোরিয়া সংযোজন)।

গ. **পরিবৃদ্ধি :** এটি ভূ-খণ্ড অর্জিত হবার একটি প্রাকৃতিক পন্থা। যখন প্রাকৃতিক কারণে (পলি জমা কিংবা বাহিত বালু জমা হওয়া) কোন সার্বভৌম ভূ-খণ্ডের পরিবৃদ্ধি ঘটে, তখন এ পন্থায় ভূ-খণ্ড অর্জিত হতে পারে। এক্ষেত্রে স্বত্ব ঘোষণার প্রয়োজন হয় না। বিভিন্ন উপায়ে এরূপ পরিবৃদ্ধি ঘটতে পারে। যেমন: নদীর মোহনায়, সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে নতুন ভূ-খণ্ড বা রাষ্ট্রীয় সমুদ্রে নতুন দ্বীপ সৃষ্টি হতে পারে। নদী যদি আন্তর্জাতিক সীমানা হয় তবে তার গতিপথ পরিবর্তনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সীমানা বাড়তে পারে।

ঘ. **দীর্ঘ দখলজনিত স্বত্বাধিকার :** সাধারণভাবে দীর্ঘ দখলজনিত স্বত্বাধিকার বা প্রেসক্রিপশন বলতে বোঝায় দীর্ঘদিন যাবত বিরুদ্ধ দখলাধিকার চর্চার মাধ্যমে কোন স্বত্বের অধিকারী হওয়া। আন্তর্জাতিক আইনেও দীর্ঘ ও কার্যকর কর্তৃত্ব বজায় রাখার মাধ্যমে স্বত্ব অর্জন করা সম্ভব। দীর্ঘদিন যাবৎ শান্তিপূর্ণ উপায়ে অন্য সার্বভৌমের অধীন কোন ভূমিতে সার্বভৌমত্ব চর্চার মাধ্যমে দীর্ঘ দখলজনিত স্বত্বাধিকার জন্মায়। তবে দখলের সাথে এ পন্থার পার্থক্য হলো, দখলে Terra nullius দখল করা হয়; অন্যদিকে প্রেসক্রিপশন অন্য সার্বভৌমত্বের অধীন ভূমিতে দখল চর্চা করা হয়।

ঙ. **সমর্পণ / বিনিময় :** ভূ-খণ্ড অর্জনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য পন্থা হচ্ছে বিনিময় বা অর্পন। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের নীতির উপরই ভূ-খণ্ড হস্তান্তরের অধিকার প্রতিষ্ঠিত। যদি দুটি রাষ্ট্র পারস্পারিক চুক্তির মাধ্যমে নিজ রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডের বিংশ বিশেষের কর্তৃত্ব অন্য রাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করে তবে তাকে সমর্পণ বা বিনিময় বলে।

চ. **De-Jure এর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ড অর্জন :** De-Jure মাধ্যমেও রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ড অর্জন করা সম্ভব। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির মাধ্যমে এই De-Jure বৈধতা লাভ করে। ১৯৬১ সালে উপমহাদেশে অবস্থিত পর্তুগিজ ভূ-খণ্ড বলে কথিত "দিউক ও গোয়া" ভারত জোর পূর্বক দখল করে নেয় এবং নিজের অংশ বলে দাবী করে। পরবর্তীতে স্বীকৃতির মাধ্যমে আজও এগুলো ভারতের দখলে রয়েছে।

ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ও জাতীয় নিরাপত্তা

ক্ষুদ্ররাষ্ট্র

জনসংখ্যা, আয়তন, জিডিপি সেনাবাহিনীর সংখ্যা, বিদেশে অবস্থানরত দেশীয় কূটনীতিকদের সংখ্যা, পারমানবিক সক্ষমতা, দারিদ্র, আন্তর্জাতিক কমিটমেন্ট, এমনকি Globalization Index ইত্যাদি বিবেচনা করে একটি রাষ্ট্রকে "ক্ষুদ্ররাষ্ট্র" হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। তবে ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ রাষ্ট্র হিসাবে উল্লিখিত সকল বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে এটি জরুরী নয়। যেমন- জাপান সামরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী না হলেও অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হাওয়ায় বৃহৎ রাষ্ট্রের মর্যাদা পেয়েছে। অন্যদিকে USA অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি অর্জন করে শক্তিশালী হওয়ায় বৃহৎ রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। নিরাপত্তা বিশ্লেষক ডঃ তালুকদার মনিরুজ্জামান তাঁর The Security of Small State in Third World বইয়ে বলেন- A small state is a with a very low conventional war capability not only in absolute global comparative terms but also vis-a-vis the large powerism in its region। সুতরাং, ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বলতে বোঝায় ঐসব রাষ্ট্রকে, যারা নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিজেদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর নির্ভর করতে পারে না। তাই তারা নিজেদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য কোন আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক সংস্থা বা বৃহৎ কোন রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সংজ্ঞা কেবল বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়; বরং আঞ্চলিক বৃহৎশক্তিগুলোর তুলনায়ও হতে পারে।

বৈশিষ্ট্য : ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ-

- বৈশ্বিক ঘটনাবলীতে কম অংশগ্রহণ করে
- আন্তর্জাতিক সংগঠনের কার্যাবলিতে বেশি মাত্রায় অংশ নেয়
- আন্তর্জাতিক আইনের বিধিগুলোর প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখে
- বৈদেশিক আচরণের বেলায় শক্তি প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকে
- বৃহৎ রাষ্ট্রকে বেকায়দায় ফেলে দেওয়ার মত কোন পদক্ষেপ ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গ্রহণ করে না।
- অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না।
- সর্বদা বিশ্ব শান্তি কামনা করে।

ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার কৌশল

তৃতীয় বিশ্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র সমূহ নিম্নলিখিতভাবে নিরাপত্তা নীতি গ্রহণ করতে পারে-

ক. **Pilot Fish এবং Cuban model :** আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশিষ্ট তাত্ত্বিক Erling Bjol তাঁর "Small State in International Politics" প্রবন্ধে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশের পররাষ্ট্রনীতি বিশেষ করে ফিনল্যাণ্ডের পররাষ্ট্রনীতি ও প্রতিরক্ষানীতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে "Pilot Fish" নীতির কথা উল্লেখ করেছেন। এক ধরনের মাছ আছে যা পাইলট মাছ বলে পরিচিত। দেখতে ছোট এই মাছগুলো হাঙ্গরের গাঁ ঘেষে চলে। গা ঘেষে চলতে গিয়ে সেই Pilot মাছগুলো তাদের জীবন বাঁচায় হাঙ্গরের শরীরের উচ্ছিষ্ট খেয়ে। এরলিং এই Pilot Fish-এর ব্যবহারকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন।

১৯৬২ সালে Bay of Pigs এর ঘটনার পর থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত কিউবার উপর মার্কিনি আগ্রাসন এতটুকুও কমেনি বরং USA জাতিসংঘকে পর্যন্ত ব্যবহার করেছে কিউবার বিরুদ্ধে। কিউবা তার প্রতিরক্ষানীতি এমনভাবে প্রণয়ন করেছে যেখানে প্রতিটি নাগরিকই একজন "সেনা সদস্য"। USA এর সাথে এক ধরনের উত্তেজনা বা সংঘর্ষের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করে কিউবা ও ভেনিজুয়েলা তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান অঞ্চলভুক্ত দেশগুলোর সীমান্তবর্তী দেশ এস্তোনিয়া, লাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়া যখন ১৯৪০ সালে সাবেক USSR অন্তর্ভূক্ত হয়, তখন ফিনল্যান্ড তার স্বকীয়তা বজায় রেখেছিল। USSR এর সাথে "ভালো সম্পর্ক" বজায় রেখে ফিনল্যান্ড তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বজায় রেখেছিল। এরলিং বেওলের Pilot Fish তত্ত্বের বড় প্রমাণ ফিনল্যান্ড। উল্লেখ তৃতীয় বিশ্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলো এই "Pilot Fish" এবং "Cuban Model" গ্রহণ করে আন্তর্জাতিক বিশ্বে তাদের জাতীয় নিরাপত্তা বজায় রাখতে পারে।

খ. **First Strike Capability :** ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহ অন্তত প্রাথমিক প্রতিরোধের জন্য একটি সুশিক্ষিত, সুসংগঠিত ও মোটামুটি আধুনিক সামরিক বাহিনী গড়ে তুলতে পারে।

গ. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন :** নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের কৌশল হিসাবে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে মনোযোগী হওয়া উচিত। সেই সাথে বিদেশি সাহায্য নির্ভরতা কমিয়ে আনা প্রয়োজন।

ঘ. **দক্ষ কূটনীতি ও নেতৃত্ব:** দক্ষ কূটনীতির মাধ্যমে নিজের শক্তি না থাকলেও অন্যান্য রাষ্ট্রের শক্তিকে বিপদের সময় নিজেদের পক্ষে ব্যবহার করার মতো নেতৃত্ব প্রয়োজন।

ঙ. **জাতীয় সংহতি :** নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে নিজেদের মধ্যকার মতাদর্শগত বিরোধ ভুলে দেশের ও জাতীয় স্বার্থকে প্রধান্য এবং নিজেদের মধ্যে জাতীয় সংহতি বৃদ্ধি করতে হবে।

চ. **প্রযুক্তিগত উন্নয়ন :** উন্নত প্রযুক্তিই দিতে পারে যে কোন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে তার ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা দূর করতে। তাই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তায় প্রযুক্তিগত উন্নয়নের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে।

ছ. **প্রতিবেশি রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা :** এটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার অন্যতম পূর্বশর্ত। সেই জন্য ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার প্রতিবেশি দেশগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটাতে হবে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে।

STUDENT STUDY

সভ্যতার বিকাশে মানুষ যত রকম সংঘ গঠন করেছে তার মধ্যে সর্বোচ্চ এবং শক্তিশালী সংঘ হচ্ছে রাষ্ট্র। রাষ্ট্র হচ্ছে একটি বাস্তব রাজনৈতিক সংগঠন। সমাজ জীবনে এক পর্যায়ে মানুষ তার জীবনের নিরাপত্তা ও সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য একটি সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে। কালের বিবর্তনে মানুষের এ প্রয়োজনীয়তা থেকেই রাষ্ট্র নামক রাজনৈতিক সংগঠনের জন্ম হয়।

ইংরেজি 'Mode' শব্দ থেকে Modern শব্দটি এসেছে, যার অর্থ হচ্ছে আধুনিক পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া। সুতরাং যে পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া সনাতন বা গতানুগতিক প্রক্রিয়া থেকে স্বতন্ত্র এবং বর্তমানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, তা-ই আধুনিক, আর এ ধরনের রাষ্ট্রকেই আধুনিক রাষ্ট্র বলে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় আধুনিক রাষ্ট্র বলতে বুঝায় এমন এক সংগঠিত জনসমষ্টি, যারা কোনো একটি নির্দিষ্ট এলাকায় সাবভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন নিজস্ব সরকারের অধীনে বসবাস করে। আধুনিক রাষ্ট্র জাতিরাষ্ট্র (Nation State) একটি সার্বভৌম সংঘ।

এলমন্ড এবং রবার্ট ডাল বলেন, 'রাষ্ট্র হলো Political System বা রাজনৈতিক পদ্ধতি'। এলমন্ডের মতে, সব স্বাধীন সমাজে বিদ্যমান মিথস্ক্রিয়ার পদ্ধতিই তাহলো রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যা Integration এবং Adoption এর কাজ করে।

আধুনিক রাষ্ট্র প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় রোমান সাম্রাজ্য থেকে ভিন্ন। আধুনিক রাষ্ট্রের উৎপত্তিকাল সম্পর্কে সঠিক ইতিহাস জানা যায়নি। তবে অনেকে মনে করেন যে, রাষ্ট্রচিন্তার অঙ্গনে মেকিয়াভেলির আবির্ভাব আধুনিক যুগের সূত্রপাত ঘটায়। তাঁকে আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার জনক বলা হয়। কারণ তাঁর চিন্তাধারা প্রাচীন ও মধ্যযুগের চিন্তাধারা থেকে ভিন্নতর। আবার অনেকে মনে করেন ইউরোপীয় রেঁনেসার সূচনালগ্ন থেকে আধুনিক রাষ্ট্রদর্শনের উৎপত্তি ঘটে।

কার্যাবলি

রাষ্ট্রে সার্বভৌমত্ব ও সংহতি এবং জনগনের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষণের জন্য রাষ্ট্রকে যে সকল কাজ করতে হয়, তাকে অপরিহার্য বা মৌলিক কার্যাবলি বলে। এ সকল কাজ সম্পন্ন না করলে রাষ্ট্র বিপন্ন হতে পারে। অপরিহার্য কার্যাবলির প্রকৃতি নির্ধারিত হয় আন্তর্জাতিক এবং আন্ত:রাষ্ট্রীয় সর্ম্পকের ভিত্তিতে, রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকদের সম্পর্কের ভিত্তিতে এবং নাগরিকগণের পারস্পারিক সম্পর্কের ভিত্তিতে। নিচে আধুনিক রাষ্ট্রের মৌলিক বা অপরিহার্য কার্যাবলি আলোচনা করা হলো-

০১. **দেশরক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলি :** দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজ। দেশরক্ষা সংক্রান্ত কাজের জন্য রাষ্ট্র স্থলবাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমানবাহিনী গঠন ও পরিচালনার মাধ্যমে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বা নিরাপত্তা বাহিনী গড়ে তোলে। বহি:শত্রুর আক্রমণ হতে দেশকে রক্ষার জন্য নিরাপত্তা বাহিনী গঠন করা রাষ্ট্রের অন্যতম কাজ। এ নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করার জন্য সরকারকে অর্থ ব্যয় করতে হয় এবং তাদের বেতন ও থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়।

০২. **পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কার্যাবলি :** রাষ্ট্রের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য প্রতিবেশিও দূরের রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে শান্তি, প্রগতি ও স্থিতিশলতা বজায় রাখার জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, সামরিক চুক্তি, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মৈত্রী ইত্যাদি পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কাজ রাষ্ট্র সম্পাদন করে।

০৩. **অভ্যন্তরীণ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলি :** রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা সংহতি রক্ষার জন্য অভ্যন্তরীণ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা অপরিহার্য। ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য রাষ্ট্র আইন শৃঙ্খলা বিধান করে। এ উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র পুলিশ বাহিনী ও অন্যান্য প্রতিরক্ষা বাহিনী সংগঠন ও পরিচালনা করে।

০৪. **প্রশাসন সংক্রান্ত কার্যাবলি :** রাষ্ট্রের অপরিহার্য কার্যাবলির মধ্যে প্রধান কাজ হলো প্রশাসন পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যবালি সম্পাদন। দক্ষতার সাথে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য এবং সরকারি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রকে প্রশাসন কাঠামো নির্মাণ এবং একদল স্থায়ী কর্মচারী নিয়োগ ও পরিচালনা করতে হয়। রাষ্ট্র তার প্রশাসন যন্ত্রের মাধ্যমে খাজনা ও কর আদায় করে, বাজেট প্রণয়ন করে এবং মুদ্রা ব্যবস্থা পরিচালনা করে। সরকারি কর্মকর্তাগণ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সরকারি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকেন।

০৫. **আইন প্রণয়ন ও বিচার সংক্রান্ত কাজ :** আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও ন্যায় বিচারের মাধ্যমে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করে এবং বিচার আদালত গঠন ও পরিচালনা করে।

০৬. **অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ :** রাষ্ট্রের সকল কার্যাবলি যতার্থভাবে সম্পাদন করার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। এ জন্য বিভিন্ন প্রকার কর নির্ধারণ ও তা সুষ্ঠুভাবে আদায় করা আধুনিক রাষ্ট্রের অন্যতম কাজ।

০৭. **উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ :** উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ রাষ্ট্রের একটি অন্যতম কাজ। তাই বর্তমানকালের রাষ্ট্রগুলো বিভিন্ন পরিকল্পনা দ্বারা নাগরিকদের যথার্থ উন্নতির ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। আর এ জন্য সরকারের কোটি কোটি দেশীয় ও বিদেশি মুদ্রা ব্যয় করতে হয়।

০৮. **জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান :** রাষ্ট্রে বসবাসকারী জনগণ যাতে অত্যন্ত নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে বাস করতে পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আধুনিক রাষ্ট্রের অন্যতম কাজ। আধুনিক রাষ্ট্রে সরকার জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করে থাকে।

➘ ঐচ্ছিক ও গৌণ কার্যাবলি

যে সকল কাজ রাষ্ট্রের স্বাধীনতা বা অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য নয়, অর্থাৎ যে সকল কার্যাবলি রাষ্ট্রের পক্ষে অবশ্যই করণীয় নয়, তবে সমাজের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনের জন্য করতে হয়, সেগুলো ঐচ্ছিক বা গৌণ কার্যাবলি বলে। জনগণের সুবিধার্থে এবং সমাজজীবনের

পূর্ণতার জন্য রাষ্ট্রকে বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্য সম্পাদন করতে হয়। সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য এগুলোর গুরুত্ব অত্যাধিক। মোটকথা, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ব্যক্তিজীবনের বহুমূখী উন্নয়ন সাধনের নিমিত্তে রাষ্ট্র যে কার্যাবলি পালন করে থাকে সেগুলোকে রাষ্ট্রের ইচ্ছামূলক বা গৌণ কার্যাবলি বলা হয়। রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কার্যের পরিমাণ ও পরিধি দিনদিনই বেড়ে চলছে-

১. **শিক্ষামূলক কার্যাবলি :** রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কাজ হল শিক্ষামূলক কার্যাবলি সম্পাদন করা। আধুনিক রাষ্ট্রকে শিক্ষা বিস্তারের জন্য স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি স্থাপন করতে হয়। তাছাড়া নারী শিক্ষার প্রসার, বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি ও নিরক্ষরতা দূর করার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ এবং তা বস্তবায়ন করতে হয়।

২. **জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত কার্যাবলি :** জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত কাজ করা রাষ্ট্রের একটি অন্যতম কাজ। জনগণই রাষ্ট্রের সম্পদ। সুস্থ্য ও সবল জনস্বাস্থ্য রাষ্ট্রের গৌরব। ফলে রাষ্ট্র জনস্বাস্থ্য রক্ষার নিমিত্তে বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করে। এ উদ্দেশ্যে হাসপাতাল, শিশুকল্যাণ কেন্দ্র, মাতৃসদন কেন্দ্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা ও তার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ঔষধ সরবরাহ, ডাক্তারদের প্রশিক্ষণ, জনগণকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে অবহিত করার জন্য প্রচারপত্র বন্টন প্রভৃতি রাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলির আওতাধীন।

৩. **ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের সম্প্রসারণ সংক্রান্ত কার্যাবলি :** আধুনিক বিশ্ব দিন দিনই শিল্প বিকাশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক বিশ্বের রাষ্ট্র সমূহ তাদের অর্থনৈতিক জীবনকে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটানোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ফলে রাষ্ট্রসমূহের শিল্প বিকাশের উদ্দেশ্যে বাণিজ্য ও সম্প্রসারণ কার্যাবলি রাষ্ট্রীয় কার্যের আওতাধীন।

৪. **দরিদ্রের সাহায্য সংক্রান্ত কার্যাবলি :** দরিদ্র জনসাধারণের সন্তান সন্ততির লেখাপড়ার জন্য রাষ্ট্র বিভিন্ন ভাবে কার্য সম্পাদন করে। বিনামূল্যে দু:স্থদের বইপুস্তক প্রদান, অর্থ প্রদান, বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করে। তাছাড়া তত্ত্বাবধান রাষ্ট্রীয় কার্যের অন্তর্ভূক্ত।

৫. **শ্রমিকদের কল্যাণ সংক্রান্ত কার্যাবলি :** শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য আধুনিক রাষ্ট্র স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে বিভিন্ন প্রকার কার্য সম্পাদন করছে। তাদের উপযুক্ত বেতন ভাতা, বাসস্থান, চিকিৎসা প্রভৃতির মত জরুরি বিষয়ের নিরাপত্তা রাষ্ট্র দিয়ে থাকে। রাষ্ট্র শ্রমিকদের কাজের সময়, মেয়াদ, মজুরি, নির্ধারণ ও শ্রমিক বিরোধের মীমাংসার জন্য 'মজুরি বোর্ড' ও 'শ্রম আদালত' স্থাপন করেছে। তাছাড়া রাষ্ট্র শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য শ্রমনীতি ও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করে। শ্রমিক স্বার্থরক্ষার জন্য 'শ্রমিক সংঘ' স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে।

৬. **যোগাযোগ রক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলি :** একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াত ও যোগাযোগ যাতে দ্রুত ও আরামদায়ক হয় রাষ্ট্র তার ব্যবস্থা করে থাকে। এ জন্য রাষ্ট্র দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে যাতায়াত ও যোগাযোগের জন্য রাস্তাঘাট, সড়ক, রেলপথ, বিমান, নৌ-চলাচল, ডাক, তার, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ প্রভৃতির ব্যবস্থা করে থাকে।

৭. **কৃষ্টি উন্নয়ন :** কৃষি তথা কৃষকদের উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কৃষকদের পুনর্বাসনে রাষ্ট্র তাদেরকে ঋণ সহায়তা প্রদান, সার, কীটনাশক ও কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদান করে থাকে।

৮. **সামাজিক নিরাপত্তা বিধান :** রাষ্ট্র সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে তৎপর। জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রগুলো আজ অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন, কল্যাণ ভাতা ও যৌথ বীমা, দু:স্থদের সাহায্য, বৃদ্ধদের বার্ধক্য ভাতা, বেকার ভাতা, বিকলাঙ্গদের সাহায্য ইত্যাদি সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বহুবিদ কল্যাণকর ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। এর ফলে সমাজের কোন কর্মহীন ব্যক্তি অন্যের মুখাপেক্ষী হয় না বা নির্ভরশীল থাকে না।

৯. **কল্যাণমূলক বা জনহিতকর কার্যাবলি :** রাষ্ট্রের যে সকল কার্যাবলি জনগণের কল্যাণের লক্ষ্যে নিবেদিত সেগুলো কল্যাণমূলক বা জনহিতকর কার্যাবলির অন্তর্ভূক্ত। আধুনিক রাষ্ট্রগুলো বহু জনহিতকর কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। যেমন : সেচ ব্যবস্থার উন্নতি সাধান, প্রাকৃতিক দূর্যোগে সাহায্য ও পুনর্বাসন, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রতিরোধ প্রভৃতি কার্যাদি।

১০. **চিত্তবিনোদনমূলক কার্যাবলি :** চিত্তবিনোদনের জন্য খেলার মাঠ, সিনেমা হল, রেডিও, টেলিভিশনে আনন্দদায়ক অনুষ্ঠান প্রচার করাও রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কার্যের অন্তর্ভূক্ত।

পরিশেষে বলা যায়, উপরিউক্ত কার্যাবলি ছাড়াও আধুনিক রাষ্ট্র আরো অনেক কার্য সম্পাদন করে থাকে তাছাড়া। জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রসারতার সাথে সাথে মানুষের চিন্তাসচতনা ও ধ্যানধারণার ব্যাপক প্রসারতা ঘটেছে। যার ফলে আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলিও বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে গণতন্ত্রে জনকল্যাণের লক্ষ্যে রাষ্ট্রের কার্যাবলি সম্পাদিত হয়। আধুনিক রাষ্ট্র এখন আর পুলিশী রাষ্ট্র নয়, জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র। সে জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রকে শিক্ষা বিস্তার, শিল্প ও কৃষির উন্নতি সাধন প্রভৃতি ধরনের কাজ করতে হয়। বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে এসব ব্যবস্থাগুলো রাষ্ট্র নিয়ে থাকে। তাই বলা হয় যে, বর্তমানে প্রত্যেক রাষ্ট্রই "বন্ধু, দার্শনিক ও পরিচালক"। রাষ্ট্রের সকল কাজও গুরুত্বপূর্ণ। তাই বর্তমানে অপরিহার্য ও ঐচ্ছিক কার্যাবলির মাধ্যকার সীমারেখা দিন দিনই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

STUDENT STUDY

Sovereignty

সার্বভৌমত্ব

রাষ্ট্রের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে সার্বভৌমত্ব সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্র গঠনে যে চারটি মৌলিক উপাদান একান্তভাবে কাম্য, সার্বভৌমত্ব তাদের মধ্যে অন্যতম। একে রাষ্ট্রীয় সংগঠনের স্পর্শমণি বলা হয়। সার্বভৌমিকতার উপর ভিত্তি করেই রাষ্ট্রের আইন ও কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রকে অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান থেকে পৃথক সত্ত্বার অধিকারী করেছে। অধ্যাপক মিলার বলেন, "We must recognize the sovereign state as the prime fact of political life."

ক. **শব্দগত অর্থ :** ল্যাটিন শব্দ 'Superanus' থেকে সার্বভৌমত্ব কথাটি এসেছে। 'Superanus' কথাটির বাংলা অর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত অর্থে সার্বভৌমত্ব বলতে রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অবাধ ক্ষমতাকেই বুঝায়।

খ. **মূল সংজ্ঞা :** নিয়ম, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং কল্যাণমূলক কার্যাদি সম্পাদন করা হল আধুনিক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে। এ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য চূড়ান্ত কর্তৃত্বসম্পন্ন রাষ্ট্র আইনকানুন প্রবর্তন করে থাকে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কর্তৃত্বকে কার্যকর করার জন্য শক্তি বা বলপ্রয়োগ করার ক্ষমতা রাখে। মোটামুটিভাবে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা বলতে রাষ্ট্রের চরম বা চূড়ান্ত কর্তৃত্বকেই বুঝায়।

১. সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ফরাসি লেখক জ্যাঁ বোঁদা বলেন, "আইনের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিক নাগরিক ও প্রজাদের উপর রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতাই হল সার্বভৌমত্ব"।

২. অধ্যাপক গেটেল বলেন, "সার্বভৌমত্ব সকল প্রকার আইনকে অনুমোদন দান এবং সকল প্রকার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে।

➘ সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য

সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা পর্যালোচনা করলে আমরা এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করি।

➘ বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে বর্ণিত হল :

০১. **মৌলিকতা, চরমতা ও সীমাহীন :** আইনগত দিক থেকে বলতে গেলে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব হল মৌলিক, নিরঙ্কুশ, অপ্রতিহত, চূড়ান্ত ও সীমাহীন। অভ্যন্তরের এবং বাইরের কোন শক্তির নির্দেশে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় না। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র প্রণীত আইনকে কোনভাবেই অস্বীকার বা অবজ্ঞা করতে পারে না। রাষ্ট্র প্রণীত আইনকে লঙ্ঘন করলে আইন ভঙ্গকারীকে কঠোর শাস্তি পেতে হয়। এমনকি গুরুতর অপরাধের জন্য রাষ্ট্র তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে। একমাত্র রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোন সংস্থার এ চরম ক্ষমতা নেই। অবশ্য সার্বভৌমত্ব আইন সংগতভাবে সীমাবদ্ধ না হলেও নৈতিক ও প্রাকৃতিক সূত্র দ্বারা সীমাবদ্ধ। স্যার হেনরী মেইন- এর মতে, "নৈতিক প্রভাব প্রতিনিয়ত সার্বভৌম শক্তির ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।" ব্লুন্টস্‌লী বলেন, "রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা বাহ্যিক দিক দিয়ে এর নিজস্ব প্রকৃতি ও ব্যক্তিসমূহের অধিকার দ্বারা সীমাবদ্ধ"।

০২. **সর্বব্যাপকতা ও সর্বজনীনতা :** রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ক্ষমতা সর্বজনীন। সর্বজনীনতা চরমতার একটি বিশেষ লক্ষণ। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরের সকল ব্যক্তি ও সামজিক সংগঠন সার্বভৌম ক্ষমতার অধীন। বহি:দেশে বসবাসকারী রাষ্ট্রের নাগরিকগণও এ ক্ষমতার অধীনতা থেকে মুক্ত নন। অবশ্য বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতেরা রাষ্ট্রের এ সার্বভৌমত্বের অস্তিত্বের বাইরে থাকে সত্য কিন্তু এটিও সংগঠিত হয় রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার আদেশক্রমে। রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে যে কোন সময় তাদের বিতাড়িত করতে পারে। সুতরাং অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সার্বভৌম শক্তি বাধা বন্ধনহীন।

০৩. **স্থায়িত্ব :** রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব সর্বদাই স্থায়ী কিন্তু সরকার পরিবর্তনশীল। সরকার হল সার্বভৌম শক্তির ব্যবহারকারী মাত্র, কিন্তু সরকারের পরির্বতনের সাথে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার কোন পরিবর্তন ঘটে না, যতদিন রাষ্ট্র থাকবে ততোদিন সার্বভৌম ক্ষমতার কোনো পরিবর্তন ঘটবে না। যতো দিন রাষ্ট্র থাকবে ততোদিন সার্বভৌম ক্ষমতা নিয়ে থাকবে। এ ক্ষমতার অবলুপ্তির সাথে সাথে রাষ্ট্রের ও অবলুপ্তি ঘটবে। কোন নির্দিষ্ট সময়ে সার্বভৌম ক্ষমতা যে ব্যক্তি বা যে সংস্থার দ্বারা ব্যক্ত হয় তার মৃত্যু ঘটলে বা সাময়িকভাবে তার ক্ষমতাচ্যুতি ঘটলে সার্বভৌম ক্ষমতার অবসান হয় না। অন্য ব্যক্তি বা সংস্থা তা ব্যক্ত করে মাত্র। অবশ্য রাষ্ট্র বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণাধীনে গেলে অথবা দ্বি-খণ্ডিত হলে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতাও আর থাকে না।

০৪. **অবিভাজ্যকতা :** সার্বভৌমত্ব প্রাকৃতিক দিক থেকেই অবিভাজ্য। একে কখনোই বিভক্ত করা যায় না। এটি একই সাথে একের অধিক ব্যক্তি বা সংস্থার হাতে ন্যস্ত থাকে না। সর্বদাই এটি একটিমাত্র কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকে। সমাজের একাধিক প্রতিষ্ঠান এ ক্ষমতার অধিকারী থাকলে সমাজব্যবস্থা সুষ্ঠভাবে অব্যাহত থাকে না এবং সেখানে কোন কিছুরই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় না। সার্বভৌম ক্ষমতার বিভাজন ঘটলে সমাজে বা রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তাই অধ্যাপক গেটেল বলেছেন, "সার্বভৌমত্ব বিভাজন ধারাণাটিই স্ব-বিরোধী।"

০৫. **অহস্তান্তরযোগ্য :** সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য গুণ। সেহেতু এটি হস্তান্তরযোগ্য নয় তাই এটি রাষ্ট্রের প্রাণস্বরূপ। প্রাণ দান করা যে রূপ জীবদেহের বিনাশের নামান্তর সেরূপ সার্বভৌমত্ব হস্তান্তর করা রাষ্ট্র ধ্বংসেরই নামান্তর। সার্বভৌম ক্ষমতার অনুপস্থিতির অর্থ রাষ্ট্রের বিলুপ্তি। রাষ্ট্রের পক্ষে এ ক্ষমতা হস্তান্তর করা আত্মহত্যারই সামিল। সুতরাং এর হস্তান্তর অসম্ভব এবং এটা রাষ্ট্রের চিৎশক্তি।

০৬. **এককত্ব:** সার্বভৌম ক্ষমতা এক ও অন্যান্য, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সার্বভৌম ক্ষমতা অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন কোন শক্তি থাকতে পারে না। যদি অন্য কোন শক্তি থাকত তবে সেই শক্তিই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হত এবং একাধিক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হত। সার্বভৌমত্বের চূড়ান্ত ক্ষমতা থেকেই আমরা এ অনুসিদ্ধান্ত করতে পারি।

পরিশেষে সার্বভৌমত্বের উপরোক্ত বেশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করলে একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সার্বভৌমত্বের উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যতই আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অধিকারী হোক না কেন, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে অস্বীকার করতে পারে না। তাই অধ্যাপক গেটেল বলেন, "The concept of sovereignty is the basis of modern political science." অর্থাৎ সার্বভৌমত্ব ধারণই আধুনিক রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি।

CLASS WORK International Institutions

কমনওয়েলথ

কমনওয়েলথ হল সাবেক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের সংগঠন। এক সময় যে সকল অঞ্চল বা জনপদগুলো ব্রিটিশ উপনিবেশ হিসেবে শাসিত হয়ে পরবর্তীতে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের হাত থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেসব রাষ্টের প্রতিষ্ঠান হচ্ছে কমনওয়েলথ। স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য ব্রিটেনের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে কমনওয়েলথ। ব্রিটেনের রাজা বা রাণী হলেন এ সংস্থার প্রধান। কমনওয়েলথের সদর দফতর লন্ডনে অবস্থিত। এ সংস্থার অফিশিয়াল ভাষা ইংরেজি।

১৯ নভেম্বর, ১৯২৬ সালে 'বেলফোর ঘোষণার' (Balfour Declaration) মাধ্যমে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশনস (British Cmmonwealth of Nations) ধারণার গোড়াপত্তন হয়। ১১ ডিসেম্বর, ১৯৩১ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক 'স্ট্যাটিউট অব ওয়েস্ট মিনিস্টার' (Statute of Westminster) আইন অনুমোদিত হয়। এ আইনের মাধ্যমে উপনিবেশগুলোর পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ করে। ২৮ এপ্রিল, ১৯৪৯ সালে 'লন্ডন ঘোষণা'র (Landon Declaration) মাধ্যমে কমনওয়েলথ আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। তবে এ সময় সংস্থাটি থেকে ব্রিটিশ শব্দটি বাদ দিয়ে 'কমনওয়েলথ অব নেশনস' (Commonwealth of Nations) করা হয়। ব্রিটিশ উপনিবেশ না হয়েও মোজাম্বিক ও রুয়ান্ডা যেমন কমনওয়েলথের সদস্য রাষ্ট্র, তেমনি ব্রিটিশ উপনিবেশ হয়েও অনেক রাষ্ট্র যেমন- মায়ানমার. আয়ারল্যান্ড, জিম্বাবুয়ে, মিসর, ইরাক, কুয়েত, সুদান, জর্ডান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কমনওয়েলথের সদস্য হয়নি। বিভিন্ন ধারা পরিক্রমায় বর্তমান কমনওয়েলথের সদস্য রাষ্ট্র সংখ্যা ৫৩।

কমনওয়েলথ ও বাংলাদেশ বাংলাদেশ কমনওয়েলথ-এর অন্যতম সদস্য। ২৮ এপ্রিল, ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ কমনওয়েলথের ৩২তম সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়। এর পর থেকে কমনওয়েলথের সাথে বাংলাদেশের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ সংস্থার মূল লক্ষ্য হল কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা সমৃদ্ধি করা।

↘ কমনওয়েলথ ও বাংলাদেশ

কমনওয়েলথ এর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। যে রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে কমনওয়েলথ এর উৎপত্তি সেই ব্রিটেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে সমর্থন করেছিল। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় ব্রিটেনের প্রচার মাধ্যমগুলো স্বাধীনতাকামী বাঙালি জনগণের ওপর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নির্মম নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, প্রতিরোধ আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রচার করে বিশ্বজনমত সৃষ্টি করেছিল। এই ধারাবাহিকতাতে স্বাধীনতার পর ব্রিটেন তথা কমনওয়েলথের সাথে বাংলাদেশের বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় অস্ট্রেলিয়ার বেতার তথা অস্ট্রেলিয়ার ভূমিকাও ছিল প্রশংসনীয়। ব্রিটেনসহ কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলো ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের বিভিন্নভাবে সাহায্য- সহযোগিতা করেছিল। স্বাধীনতা লাভের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করার জন্য কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলো সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল।

কমনওয়েলথের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ কলম্বো পরিকল্পনার সদস্য। এ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বাংলাদেশের অনেক শিক্ষার্থী কমনওয়েলথ বৃত্তি নিয়ে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোতে উচ্চতর শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ লাভ করছে। শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি কমনওয়েলথ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট সমাধানেও প্রচেষ্টা চালায়। বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্য হওয়ার পর কমনওয়েলথের প্রতিটি শীর্ষ সম্মেলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ এবং কার্যকর ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের প্রথম সরকার প্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে অটোয়ায় অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করেন।

ব্রেটন উডস সম্মেলন

১৯৪৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ার এর ব্রেটন উডস শহরে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৪ সালের ১ থেকে ২২ জুলাই পর্যন্ত এ সম্মেলনে বিশ্বের ৪৪টি দেশের ৭৩০ জন প্রতিনিধি অংশ নেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থা গঠন, যুদ্ধোত্তর রাষ্ট্রসমূহের পুণর্গঠন ও উন্নয়ন সাধন এবং বাণিজ্য ব্যবস্থা সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

সম্মেলনে এ মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, উক্ত বিষয়গুলোর প্রয়োগকল্পে সঠিক কাঠামো নির্মাণের উদ্দেশ্যে ৩ টি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করা যুক্তিযুক্ত হবে। প্রস্তাবিত ৩ টি বহুজাতিক ব্যবস্থা নিম্নরূপ:

১. বিশ্বব্যাংক (IBRD),
২. আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF),
৩. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা (WTO)।

এদের প্রধান কাজ হবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সমস্যাসমূহ পর্যবেক্ষণ ও সমাধানের উপায় বের করা। ১৯৪৪-৪৫ সাল নাগাদ প্রথমে ২ টি সংস্থা (বিশ্বব্যাংক গ্রুপের IBRD এবং IMF) প্রতিষ্ঠা লাভ করে । কিন্তু তৃতীয়টি নিয়ে দেখা দেয় বিবাদ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য কতিপয় রাষ্ট্র বাণিজ্য ব্যবস্থা তদারকির জন্য একটি পরিবর্তনশীল সংস্থা হিসাবে গ্যাটের জন্ম দেয় ১৯৪৭ সালে। ১৯৬৪ সালে জাতিসংঘ পর্ষদ প্রদত্ত বিকল্পের ভিত্তি ভূমিতেই UNCTAD প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এক সময় মনে হয়েছিল যে, ১৯৬৪ এর UNCTAD ১৯৪৭ এর গ্যাটের প্রতিস্থাপক হবে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বোতভাবে গ্যাটকে সমর্থন করায় গ্যাট পর্যায়ক্রমে শক্তিশালী হতে থাকে।

বর্তমানে 'ব্রেটন উডস ইনস্টিটিউশন' বলতে বুঝায় ২ টি প্রতিষ্ঠানকে। যথা- বিশ্বব্যাংক (IBRD) ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) কে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা

WTO বর্তমান বিশ্বর সবচেয়ে বহুল আলোচিত বিষয়গুলোর অন্যতম। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলো মনে করে এটা উন্নত বিশ্বের স্বার্থ রক্ষার প্রতিষ্ঠান। অনুন্নত রাষ্ট্রগুলো মনে করে এটা শোষণের নয়া হাতিয়ার। আর উন্নত বিশ্ব মনে করে এটা উন্নত বিশ্বের সাথে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক ভারসাম্য আনয়েনের জন্য সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। এ জন্যই যেখানেই WTO-এর সম্মেলন হয় সেখানেই এর বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়। মূলকথা হল WTO বা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা হল বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থার একটি বৈধ ও প্রতিষ্ঠনিক কাঠামো, যা বিশ্বের দেশসহুমের মধ্যে আলপ-আলোচনার মাধ্যমে বাণিজ্যক বিষয়াবলি আলোচনা করে, প্রয়োজনে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিদ্যমান নীতিমালর ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালায়।

WTO এর পূর্বসূরী হল GATT । WTO কে GATT এর আধুনিক সংস্করণও বলা যেতে পারে। ১৯৮৬ সালে উরুগয়েতে GATTএর অষ্টম রাউন্ডে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গড়ে তোলার আলোচনা শুরু হয় যা উরুগুয়ে রাউন্ড নামে পরিচিত। দীর্ঘ ৭ বছর ধরে আলোচনা করে ১৯৯৩ সালে জেনেভায় উরুগুয়ে রাউন্ড আলোচনার চূড়ান্ত ফলাফল বা Final Act গৃহীত হয়। ১৯৯৪ সালের ১৫ এপ্রিল মরক্কোর মারাকেশে ১১৭টি দেশের মন্ত্রীগণ সামান্য পরিবর্তন করে Final Act স্বাক্ষর করেন। এতে ২৯টি বাণিজ্য চুক্তি অন্তভূক্ত ছিল। GATT, WTO এর পূর্বসূরী হলেও প্রতিষ্ঠান দুটি এক না। গ্যাট ছিল একটি দুর্বল প্রকৃতির প্রতিষ্ঠান। গ্যাটের উদ্দেশ্যে ছিল শুধু পণ্য সম্পর্কিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক নির্ধারণ করা। সে তুলনায় WTO অনেক বিস্তৃত বিষয় নিয়ে গঠিত। WTO তে পণ্য বিষয় ছাড়াও সেবাখাত এবং Intellectual Property Rights অন্তর্ভুক্ত আছে যা GATT এ ছিল না। যদিও গ্যাটের নিয়মকানুন নিয়েই WTO গঠিত তবুও WTO আধুনিক বিশ্বের জন্য একটি অধিকতর শক্তিশালী একটি প্রতিষ্ঠান।

উরুগুয়ে রাউন্ডের Final Act স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমুহ নিয়ে ১৯৯৫ সালে পহেলা জানুয়ারি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কার্যক্রম শুরু হয়। এর সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল মুক্ত বাণিজ্য প্রবর্তন করা, সদস্য দেশ গুলোর পারস্পরিক সমস্যা সমাধান করা। বিশ্ব বাণিজের ৯০% WTO এর সদস্য দেশসমুহের মধ্যে হয়ে থাকে।

➘ WTO এর মৌলিক নীতিমালা

- ✓ সদস্য দেশসমূহের পারস্পারিক আলোচনারভিত্তিতে শুল্কহার নির্ধারণ;
- ✓ সমতার ভিত্তিতে সমস্যা নিরসন;
- ✓ সীমিত আকারের সংরক্ষণ;
- ✓ পক্ষপাত নিরপেক্ষ বাণিজ্যনীতি;
- ✓ সংগঠনের নীতিমালার সাথে অভ্যন্তরীন নীতিমালা দেখা।

➘ WTO এর প্রধান কার্যাবলি

- ✓ উরুগুয়ে রাউন্ডের চুক্তিসমূহের প্রয়োগ ও বাস্তবায়তন করা;
- ✓ বহুপাক্ষিক বাণিজ্য আরোচনার জন্য ফোরাম হিসেবে কাজ করা;

- ✓ বাণিজ্য সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি করা;
- ✓ বিভিন্ন সদস্যদেশের জাতীয় বাণিজ্য দনীতিমালা পরীক্ষ করা দেখা;
- ✓ কারিগরি সহযোগিতা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশ সমূহের বাণিজ্য নীতিমালার বিষয়ে সহায়তা করা।

BRICS

ব্রিকস জোট গঠনের ইতিহাস

BRICS গঠনের আগে ব্রাজিল, রাশিয়া, ইন্ডিয়া, এবং চীনকে নিয়ে BRIC গঠিত হয়েছিল। বিখ্যাত বিনিয়োগ সংস্থা গোল্ডম্যান স্যাকস এর চেয়ারম্যান Jim O'Neil সর্বপ্রথম BRIC নামটি ব্যবহার করেন। তিনি ২০০১ সালে উক্ত ৪টি দেশের উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সবিবেচনা করে পূর্বাভাস করেছিলেন যে আগামী ২-৩ দশকের মধ্যে দেশগুলোর সম্মিলিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড G-৭ দেশগুলো থেকে এগিয়ে যাবে। Jim O'Neil এর পূর্বাভাসটি ছিল সত্যিই চমকপ্রদ। কেননা তিনি যখন এটি প্রকাশ করেন তখন G-৭ এর সাতটি দেশের হাতে পৃথিবীর ৬৪ শতাংশ সম্পদ।

গোল্ডম্যান স্যাকস এর পূর্বাভাস আমলে নিয়ে উক্ত ৪টি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ ২০০৬ সালে নিউইয়র্কে একটি বৈঠকে মিলিত হন। উক্ত বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে ২০০৯ সাল থেকে প্রতি বছর দেশগুলোর আনুষ্ঠানিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ২০১০ সালের সম্মেলনে সাউথ আফ্রিকা নতুন সদস্য হিসেবে যোগ দিলে উক্ত জোটের নাম পরিবর্তিত হয়ে BRICS হয়।

ব্রিকস ব্যাংক (NDB)

➘ ব্রিকস ব্যাংক (NDB) গঠনের ইতিহাস

ব্রিটন উডস প্রতিষ্ঠান তথা বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ এর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ আছে যে অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মতামত সবসময় উপেক্ষিত থাকে। তাই উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশগুলোর স্বার্থ রক্ষিত হয় না। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ এর সিদ্ধান্তগুলোও আসে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং ইউরোপের কয়েকটি দেশ থেকে একতরফা ভাবে। কারণ যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং ইউরোপের কয়েকটি দেশের শেয়ার বেশি বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের ভোট ক্ষমতা বেশি। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ছাড়া বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট হওয়া যায় না। আবার আইএমএফ এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর সর্বদাই ইউরোপের নাগরিক থেকে নির্বাচিত হয়।

এই অবস্থায় ব্রিকসভুক্ত দেশগুলো বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ এর সীমাবদ্ধতাগুলো কাটিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বার্থ নিশ্চিত করতে ২০১৪ সালে তাদের ৬ষ্ঠ সম্মেলনে বিশ্বব্যাংকের বিকল্প হিসেবে একটি ব্যাংক গঠন করে। ব্যাংকটির নাম দেওয়া হয় নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (NDB)। ব্যাংকটির মূলধন হবে ১০০ বিলিয়ন ডলার বিশ্বব্যাংকের অর্থের অর্ধেক। ২০১৫ সাল থেকে ব্যাংকটি কার্যক্রম শুরু করে। NDB ব্যাংকের সদস্যদের সবার সমান ভোটের অধিকার থাকবে। ব্যাংকটির সদর দপ্তর চীনের সাংহাই এবং প্রথম প্রেসিডেন্ট কে.ভি. কামাথ।

➘ NDB ব্যাংকের উদ্দেশ্য

১। উন্নয়নশীল দেশগুলোর অবকাঠামোগত টেকসই উন্নয়নে ঋণ সহায়তা প্রদান করা।
২। BRICS Contingent Reserve Arrangement এর মাধ্যমে নেতিবাচক ট্রেড ব্যালেন্স শুধরানো।

➘ AIIB ব্যাংকের সাথে NDB ব্যাংকের পার্থক্য

১। AIIB ব্যাংক শুধু এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশগুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়নে ঋণ প্রদান করবে অন্যদিকে NDB ব্যাংকের কার্যক্রম এশিয়ার বাইরেও বিস্তৃত।
২। AIIB ব্যাংক চীনের উদ্যোগে গঠিত হয় অন্যদিকে NDB ব্যাংক ব্রিকসভুক্ত ৫টি দেশের উদ্যোগে গঠিত হয়।
৩। বিশ্বব্যাংকের মতো AIIB ব্যাংকের ভোটিং ক্ষমতা ব্যাংকে শেয়ারকৃত অর্থের অনুপাতের উপর নির্ভর করবে। অর্থাৎ মূলধনে যে দেশের যত অবদান থাকবে সে দেশের ভোটিং ক্ষমতা সে অনুপাতে হবে। যেমন বাংলাদেশ প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ ০.৮৯%, অস্ট্রেলিয়া ৩.০%, ভারতের ৮.০২%, চীনের ২৭.৮৪। সুতরাং সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাংলাদেশ থেকে ভারতের ভোট ক্ষমতা ১০ গুণ বেশি। অন্যদিকে NDB ব্যাংকে BRICS ভুক্ত প্রত্যেক সদস্য দেশের ভোটিং ক্ষমতা সমান।
৪। AIIB ব্যাংক গঠিত হয় ২০১৬ সালে (২০১৫ সালে আর্টিকেল অব এগ্রিমেন্ট সাক্ষরিত হয়)। NDB ব্যাংক গঠিত হয় ২০১৪ সালে।
৫। AIIB ব্যাংকের মেম্বার ৫৭টি দেশ, NDB ব্যাংকের মেম্বার ৫টি দেশ।
৬। AIIB এবং NDB উভয় ব্যাংকের মূলধনই ১০০ বিলিয়ন ডলার।

ASEAN

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বকে নিরাপদ ও বাসযোগ্য করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী দেশসমূহকে জাতিসংঘের পতাকা তলে আনা হয়। এর মাধ্যমেই দেশগুলো তাদের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করবে-এমনটাই আশা ছিল বিশ্ব

নেতাদের। কিন্তু ভৌগোলিক বৈপরীত্য, আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক ফাঁরাক এমন অনেক সমস্যাকে সামনে নিয়ে আসে, যাতে ইচ্ছা থাকলেও তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তাই আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক কিংবা মহাদেশীয় রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামরিক বিভিন্ন সংস্থা বা জোট গড়ে ওঠে। এরকম প্রেক্ষাপটে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি সমমনা দেশ প্রধানতঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৬৭ সালে গঠন করে আসিয়ান (ASEAN-Association of South East Asian Nations)। গঠনের পর থেকেই আসিয়ান দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াসহ দূর প্রাচ্যের দেশগুলোতে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ কারণে বিশ্বের কয়েকটি সফল সংস্থার মধ্যে আসিয়ানকে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশ আসিয়ানের পর্যবেক্ষকের মর্যাদা পেয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নয়নকামী রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ আসিয়ানের সঙ্গে কার্যকর সুসম্পর্ক রক্ষা করতে চায়।

আসিয়ানের গঠন : ১৯৬৭ সালের ৮ আগস্ট থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে দক্ষিণ পূর্ব এয়িশার ৫টি দেশে - ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর ও ফিলিপাইন নিজদের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর করে ASEAN গঠন করে। বর্তমানে আসিয়ানের অন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলো হলো - ভিয়েতনাম, মিয়ানমার, লাওস, কম্বোডিয়া এবং ব্রুনেই। সদস্যভূক্ত দেশগুলো ছাড়াও আসিয়ানের পর্যবেক্ষক ২৬টি দেশ ও সংস্থা। চীন, জাপান, দঃকোরিয়া, ইইউ, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজন্য, ভারত, বাংলাদেশ আসিয়ানের পর্যবেক্ষকের মর্যাদা পেয়েছে।

➘ আসিয়ান ও বাংলাদেশ

আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ও মধুর। আসিয়ানভুক্ত তিনটি মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনেই-এর সাথে আমাদের সম্পর্ক অনেক পূর্ব থেকে। সম্প্রতি মালয়েশিয়া এবং ব্রুনাইয়ে বাংলাদেশের অনেক দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিক, কারিগর প্রেরণ করা হয়েছে। তাদের পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ২০০৩ সালের পর থেকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতিতে Look East বা পূর্ব দিকে তাকাও নীতির উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে আসিয়ানভূক্ত মায়ানমার, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের সাথে সম্পর্কের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। এসব দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ যেমন বাংলাদেশে এসেছেন। তেমনি বাংলাদেশের সরকার প্রধানরা এসব দেশ সফর করেছেন।

পূর্ব এশিয়ার মায়ানমার ও থাইল্যান্ডের সাথে টেকনাফের হয়ে সড়ক সংযোগের সুযোগ এসেছে বাংলাদেশের জন্য। এ মহাসড়কের পথ ধরে আরো বহু দেশের সাথে বাণিজ্যিক লেনদেন, বিনিয়োগ এবং শুল্কমুক্ত রপ্তানির প্রতিশ্রুতি পেয়েছে বাংলাদেশ। মায়ানমার ও থাইল্যান্ডে ইতোমধ্যে অনেকগুলো বাণিজ্যিক পণ্য রপ্তানির প্রশ্নে শুল্ক তুলে নিতে রাজী হয়েছে। সুতরাং বলা চলে যে, বাংলাদেশের সাথে আসিয়ানের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ।

বাংলাদেশ আসিয়ান-এ অন্তর্ভুক্তির আগ্রহ ব্যক্ত করে আসছে বেশ কিছুদিন আগে থেকে। বাংলাদেশের আসিয়ানএ অন্তর্ভূক্তির বিষয়টি এখন প্রক্রিয়াধীন। এটি সম্ভব হলে অর্থাৎ বাংলাদেশ আসিয়ান-এর সদস্যভুক্ত হলে আমাদের অর্থনীতির দিগন্ত আরো উন্মোচিত হবে।

Amnesty International

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল একটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন। বিনাবিচারে আটক ব্যক্তিদের মুক্তির লক্ষ্যে নিবেদিত এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটি ১৯৬১ সালের ২৮ মে ব্রিটিশ আইনজীবী পিটার বেনেনসেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য এটি একটি সোচ্চার সংগঠনে পরিণত হয়। অবশ্য বিশ শতকের সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন এই সংগঠনের কর্মকান্ড শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত এটি বাংলাদেশে তেমন সাড়া জাগাতে পারে নি। কিন্তু সংগঠনটি সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই তিনি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি নিযুক্ত হওয়ার কারণে সম্ভবত এখানে আন্দোলনের কর্মকান্ড থমকে দাঁড়ায়। আশির দশকের গোড়ার দিকে কিছু আগ্রহী সমাজকর্মীর উদ্যোগে ঢাকায় অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের কর্মকান্ড পুনরায় শুরু হয়। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের আন্তর্জাতিক সচিবালয় ১৯৮৫ সালের ২৮ জুন এই ঢাকা গ্রুপকে স্বীকৃতি দেয়। পরবর্তী সময়ে আরও কিছু গ্রুপ গড়ে ওঠে এবং এদের মধ্যে ১৯৮৯ সালের জানুয়ারি মাসে মাদারীপুর গ্রুপ, ১৯৯০ সালের জানুয়ারি মাসে রাজৈর গ্রুপ এবং ১৯৯১ সালের আগস্ট মাসে কালকিনি গ্রুপ স্বীকৃতি লাভ করে। অতঃপর আইনজীবী গ্রুপ, মহিলা গ্রুপ ও চিকিৎসক গ্রুপের মতো কিছু কিছু স্থানীয় ও পেশাজীবী গ্রুপ গড়ে ওঠে। বর্তমানে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বাংলাদেশ অংশে প্রায় ৪০টি স্থানীয় ও পেশাজীবী গ্রুপে সর্বমোট সহস্রাধিক সদস্য রয়েছেন। ১৯৯২ সালের ২৮ আগস্ট ঢাকায় অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বাংলাদেশ শাখার প্রথম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে একজন সভাপতি, একজন সহসভাপতি, একজন কোষাধ্যক্ষ এবং ৭ জন সদস্য সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রথম নির্বাহী কমিটি গঠিত হয়। একজন সার্বক্ষণিক পরিচালক বাংলাদেশ শাখার দাপ্তরিক কাজকর্ম পরিচালনা করেন। ঢাকার কমলাপুরে কবি জসীমউদ্দীন রোডের ২৮ নং বাড়িতে সংস্থার দপ্তর অবস্থিত।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বাংলাদেশ শাখা মানবাধিকার লঙ্ঘন রোধের কৌশলের ওপর সদস্যদের প্রশিক্ষণ দানের জন্য কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন রোধের জন্য এই প্রতিষ্ঠান সভা, সেমিনার ও শোভাযাত্রা ইত্যাদিরও আয়োজন করে। এই প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ১ মে মে দিবস এবং ১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানিবাধিকার দিবস উদযাপন করে থাকে। ভিন্নমতাদর্শী হিসেবে আটককৃতদের আশু ও নিঃশর্ত মুক্তি, রাজবন্দিদের স্বচ্ছ ও

দ্রুত বিচারকার্য সম্পাদন, সব ধরনের উৎপীড়ন ও নির্যাতনের অবসান এবং মৃত্যুদন্ড রহিতকরণের জন্য এই সংগঠন কাজ করে চলেছে। এই প্রতিষ্ঠান মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাসম্বলিত তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ করে এবং এই করে এ ধরনের লঙ্ঘনের ঘটনা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য জনগণ ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। এসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল নিয়মিত বুলেটিন, প্রচারপত্র ও পোস্টার প্রকাশ করছে।

CLASS WORK Non-State Actors

Non State Actor (অ-রাষ্ট্রীয় কর্মক) একটি স্বত্তা বা গোষ্ঠী যারা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বা রাষ্ট্র সমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এ ধরনের কর্মক হতে পারে কোন আন্তর্জাতিক সংগঠন (বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা ইত্যাদি), এনজিও, কোন বহুজাতিক সংগঠন দেশকে বৈদেশিক মাসন থেকে মুক্ত করার জন্য নিয়োজিত সশস্ত্র বাহিনী অথবা কোন সন্ত্রাসী গ্রুপ। সিয়াটলে ডব্লিউ.টি.ও-র মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন বানচাল হওয়ার পিছনে প্রতিবাদী মানুষের আন্দোলন অ-রাষ্ট্রীয় কর্মক বৈ অন্য কিছু নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তিও অরাষ্ট্রীয় কর্মক হিসেবে বিশ্বরাজনীতিকে প্রভাবিত করতে পারেন। যেমন, ড. মোহাম্মদ ইউনুস, বিল গেটস বা বিন লাদেন, পোপ ফ্রান্সিস স্ব স্ব ক্ষেত্রে। পোলান্ডের লেচ ওয়েলেসার সলিডারিটি মুভমেন্টকে নির্দ্বিধায় অ-রাষ্ট্রীয় কর্মকের দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরা যায়। যা পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতনের সূচনা করে।

রাষ্ট্র ছাড়া বর্তমান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় আরও অনেক সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী সংস্থা আছে। যাদের অ-রাষ্ট্রীয় ভূমিকা পালনকারী রূপে অভিহিত করা হয়। এই সকল সংস্থা বা সংগঠন রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী ভূমিকা পালকারীতে পরিণত হয়েছে। এদের বাদ দিয়ে সাম্প্রতিককালের আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাষ্ট্র এককভাবে ভূমিকা পালন করতে পারে না। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক, আর্থিক, বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক সংগঠন ও গোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। চার্চ, স্বাধীনতা আন্দোলনকারী সংস্থা, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংগঠন (যেমন- আসিয়ান, জাতিসংঘ), বহুজাতিক কোম্পানী ইত্যাদির ভূমিকা বর্তমানে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন ও বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এগুলোকেই বলা হয় অ-রাষ্ট্রীয় ভূমিকা পালনকারী (Non State Actors)।

Relation Between State and Non-State Actors

আধুনিক রাষ্ট্রের অন্যতম একটি কার্যগত বৈশিষ্ট্য হল অতি-জাতীয়, রাষ্ট্রীয় এবং অ-রাষ্ট্রীয় সক্রিয় ভূমিকা পালনকারীদের উদ্ভব। মতাদর্শগত আন্দোলন হলো তার একটি উপাদান। রাজনৈতিক মতাদর্শ অনেক ক্ষেত্রেই ভৌগোলিক সীমানা ভেঙ্গে দেয়। ধর্মীয়, মতাদর্শগত এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ এই ধরনের অ-রাষ্ট্রীয় ও অতি-জাতীয় ভূমিকা পালনকারী। আরব লীগ, OIC, PLO, Zionist Lobby, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন কোনো একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নিজেদের ক্রিয়াকলাপকে আবদ্ধ রাখে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, প্যালোষ্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন একটি জাতীয় আন্দোলন রূপে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

০১. **ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক :** আন্ত:রাষ্ট্রীয় বে-সরকারি সংস্থার মধ্যে ক্যাথলিক চার্চের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। এই সংস্থা মুখ্যত ধর্মীয়। কিন্তু ইতালি, জার্মানি, সাইপ্রাসসহ অনেক দেশের রাজনীতিতেই এই সংস্থার প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। অ-রাষ্ট্রীয় ভূমিকা পালনকারীদের মধ্যে এবং বিশেষ কোন রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ নেই এমন সংস্থার মধ্যে ক্যাথলিক চার্চ সর্বাপেক্ষা প্রচীন। ঐ চার্চের প্রশাসনিক দপ্তর রোমে প্রতিষ্ঠিত হলেও তার প্রভাব সকল দেশেই পরিব্যাপ্ত। রোমের এই চর্চাকে ভ্যাটিকান নামে উল্লেখ করা হয়। প্রায় ১৮০টি রাষ্ট্রের সঙ্গে ভ্যাটিকানের কূটনৈতিক সম্পর্ক আছে। ভ্যাটিকান বা রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রশাসনিক কাঠামো ক্রম-স্তর-বিন্যস্ত। বিভিন্ন দেশের রোমান ক্যাথলিন চার্চ তার নির্দেশ পালনে বাধ্য। রোমান ক্যাথলিন চার্চ আপতদৃষ্টিতে অ-রাজনৈতিক। কিন্তু ক্যাথলিন-অধ্যুষিত অঞ্চলে ক্যাথলিক চার্চের পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কখনও কখনও তার রাজনৈতিক কার্যকলাপ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাম্প্রতিককালে পোল্যাণ্ডে সলিডারিটির সঙ্গে সরকারের বিরোধে পোপ মধ্যস্থতার প্রস্তাব করেছিলেন। ১৫৯৪ সালে ক্যাথলিক-বিরোধ খ্রীষ্টানগণ চার্চসমূহের বিশ্ব পরিষদ প্রতিষ্ঠা করলেও তার প্রভাব রোমান ক্যাথলিক চার্চের মতো এত ব্যাপকতা লাভ করে নি। ক্যাথলিক চার্চের কার্যাবলিকে জাতীয় সীমানা অতিক্রমকারী কার্যাবলি রূপে গণ্য করা হয়। কারণ, এর কোন শাখা বিপদগ্রস্থ হলে সেই শাখা সমস্ত সংস্থার কাছ থেকে আর্থিক, প্রশাসনিক এবং অন্যান্য সাহায্য লাভ করে। ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে আন্তর্জাতিক রাজনীতির নিরবিচ্ছন্ন সংশ্রব নেই। তবে কখনও কখনও রাজনৈতিক

যোগাযোগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভিয়েতনাম যুদ্ধ, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ, বিশ্বশান্তি, বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রকৃতি সম্পর্কে পোপ তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর এই মতামত বিশ্বব্যাপী রোমান ক্যাথলিক সাধারণ মানুষ এবং নীতি-নির্ধারণকারীদের মতামত প্রভাবিত করতে পারে। ধর্মাবলম্বী বা হিন্দুদের ঐ ধরনের প্রভাবশালী কোন কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক সংগঠন নেই।

০২. **শ্রমিক সংঘ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক:** শ্রমিক সংস্থাও জাতীয় গণ্ডি অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। বিভিন্ন দেশের শ্রমিক সংস্থা ঐক্যবদ্ধভাবে আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের জন্য উৎসাহিত হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শ্রমিকদের দুটি বিশাল আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়ে উঠেছে একটি হল সমাজতন্ত্র মতাবলম্বীদের দ্বারা প্রভাবিত World Fedaration of trade Unions (WFTU) এবং অপরটি হল পুঁজিবাদী দেশ প্রভাবিত International Confedaration Trade of Free Trade Unions (ICFTU)। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থাসমূহের প্রধান লক্ষ্য হল আন্তর্জাতিকভাবে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করা। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এরা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে না। কিন্তু এদের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধন অনেক ক্ষেত্রে এই সকল সংস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত থাকে। ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব্ ট্রেড ইউনিয়ন ও ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব্ ফ্রী ট্রেড ইউনিয়ন যথাক্রমে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী রাজনীতি-প্রভাবিত সংস্থা। বর্তমানে আন্ত:রাষ্ট্রীয় বে-সরকারি সংস্থাগুলোর সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আন্ত:রাষ্ট্রীয় বে-সরকারি সংস্থার মধ্যে ধর্মীয়, পেশাদারী, শ্রমিক সংঘ, রাজনৈতিক দল, বৃত্তি-ভিত্তিক জাতীয় বা আন্তর্জাতিক সংস্থা আছে। বিভিন্ন দেশে জাতি এবং উপজাতীয় গোষ্ঠী, চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে ইহুদিদের সংগঠিত গোষ্ঠী ঐ সকল দেশের নীতি-নির্ধারণকারীদের উপর চাপ সৃষ্টি করে আরবদের অনুকূলে নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে। প্যালেস্টাইন মুক্তি সংগঠনকে (PLO) একটি বিশেষ ধরনের আন্ত:রাষ্ট্রীয় বে-সরকারি সংস্থারূপে অভিহিত করা যায়। কোন মধ্যস্থতাকারীর সাহায্য ছাড়াই এই সংগঠনটি বিভিন্ন রাষ্ট্রে তার প্রতিনিধি প্রেরণ করেছে। এমন কী বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি অর্জন করেছে। জাতিসংঘেও তাকে পরিদর্শকের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। প্যালেস্টাইনের ইসরাইল অধিকৃত অঞ্চলের স্বায়ত্ত্বশাসন অর্জনে এই সংস্থাই মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

০৩. **অর্থনৈতিক সংস্থা হিসেবে বহুজাতিক কোম্পানী ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক :** বহুজাতিক সংস্থার নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। এই সংস্থাগুলো অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপকেই কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এদের ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্র বিভিন্ন দেশে প্রসারিত। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চাপ সৃষ্টি করে তারা কার্য-পরিচালনাকারী দেশের অর্থনৈতিক নীতিকেই কেবল প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করে না; ঐ সব দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও হস্তক্ষেপ করে থাকে। কারণ বহুজাতিক সংস্থাগুলো বিদেশে নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী সরকারের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে। কখনো কখনো ঐসব সরকারের উচ্ছেদ সাধনে উদ্যোগ গ্রহণ করে। লাতিন আমেরিকার রাজনীতির ক্ষেত্রে বহুজাতিক সংস্থার এই ভূমিকা সর্বজনবিদিত। এই সব সংস্থা একদিকে চাপ দিয়ে সরকারের মাধ্যমে নিজেদের অনুকূল অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণে সচেষ্ট হয়। দুর্বল ও অনুন্নত দেশগুলো এই চাপের কাছে নতি স্বীকার করে। অর্থনৈতিক সুবিধা দিতে অস্বীকৃত হলে এই বহুজাতিক সংস্থাগুলো রাজনৈতিক হস্তক্ষেপেও কুণ্ঠাবোধ করে না। ফলে দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর জাতীয় সার্বভৌমিকতা ও স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হয়।

০৪. **আন্ত:রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক :** আন্ত:রাষ্ট্রীয় সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী সংস্থাও সার্বভৌম ভূ-খণ্ড কেন্দ্রিক জাতীয় রাষ্ট্রের প্রাধান্যকে ক্ষুন্ন করেছে। বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজেদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক প্রয়োজনে বিভিন্ন আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন এবং তার সদস্যপদ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে সারা বিশ্বে এই সব সংস্থার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৬৯ সালে এদের সংখ্যা ছিল ২২০টি। ১৯৮৩ সালে তা দাঁড়ায় ৩৩০ টিতে।। এই সব সংস্থাকে সামরিক অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং বহু উদ্দেশ্যসাধক সংস্থার বিভক্ত করা হয়। সামরিক সংস্থারূপে ন্যাটো এবং বিলুপ্ত ওয়ারশ চুক্তি জোটের নাম উল্লেখ করা যায়। বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক অর্থনৈতিক সংস্থার মধ্যে আছে আসিয়ান (ASEAN), পূর্বতন কোমেকন (COMECON), সেন্ট্রাল আমেরিকান কমন মার্কেট, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), বিশ্ব শ্রমিক সংস্থা (ILO), নাফটা (NAFTA), আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তহবিল (IMF), বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) ইত্যাদি। বহু উদ্দেশ্যসাধক সংস্থার মধ্যে আছে আফ্রিকার ঐক্যসংস্থা (OAU) সার্ক, ও. এ. এস. (OAS-Organization of American states) ।

এই সকল সংস্থার সদস্যপদ গ্রহণের সঙ্গে প্রতিটি সদস্য-রাষ্ট্রকে কয়েকটি বাধ্যবাধকতা স্বীকার করে নিতে হয়। এর ফলে কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই নিজের একক ইচ্ছানুযায়ী চলার কোন অধিকার থাকে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ন্যাটো বাহিনীতে প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রকে সেনা পাঠাতে হয়। ন্যাটো ভূক্ত কোন দেশ আক্রান্ত হলে অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্র তাকে সাহায্য করবে। ১৯৯৪ সালের ১৫ই এপ্রিল মারাকাশে গ্যাট চুক্তিতে স্বাক্ষরের ফলে স্বাক্ষরদানকারী সকল রাষ্ট্র স্বাধীনভাবে নিজের বিবেচনা অনুযায়ী আর বাণিজ্যিক নীতি অনুসরণ করতে

পারবে না। বাণিজ্যিক নীতি অনুসরণের সার্বভৌম ক্ষমতা থেকে তারা বঞ্চিত হয়। এমনকি দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হ্রাস পায়।

০৫. **আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক :** আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন এবং এক রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য রাষ্ট্র নাশকতামূলক কার্যকলাপ পরিচালনা রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডগত অ-খণ্ডতাকে ধ্বংস করেছে। আন্ত:রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন অনেক ক্ষেত্রে অন্যান্য রাষ্ট্রের আশ্রয়ে গড়ে ওঠে। পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের পাকিস্তানের সামরিক প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক অস্ত্র সরবরাহ করা হচ্ছে। এর সঙ্গে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টার সার্ভিসেস ইনটেলিজেন্স -এর (I. S. I) যোগ আছে বলে ভারতের পক্ষ থেকে বলা হয়। ১৯৯৩ সালে মুম্বাইতে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে এবং ২০০৮ সনে মুম্বাইয়ে সশস্ত্র হামলায় এই সংস্থার হাত আছে বলে মনে করা হয়। অনেক সময়ে সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সির বিরুদ্ধে নাশকতামূলক ও সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপে মদদ দেবার অভিযোগ উঠেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দ্য আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি (I.R.A), সাইপ্রাসে গ্রীক ও তুর্কি সন্তাসবাদী গোষ্ঠী, শ্রীলঙ্কার এল.টি.টি.ই সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী বলে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সম্প্রতি আল কায়েদা ও আই এস আলোচিত সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে পরিচিত পেয়েছে। এদের শাখা অনেক দেশে বিস্তার লাভ করেছে। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদকে এখন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বিরোধ আন্দোলন রূপেই বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

০৬. **আন্তর্জাতিক আইন ও সংগঠন এবং রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক :** আন্তর্জাতিক আইন ও সগঠন রাষ্ট্রের সাবেকী কর্তৃত্ব ও ভূমিকাকে পরিবর্তিত করেছে। আন্তর্জাতিক আইন বলতে আন্ত:রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপ পরিচালনার নির্দিষ্ট নিয়মাবলিকেই বোঝায়। আন্তর্জাতিক চুক্তি-সন্ধি, সম্মেলন, পারস্পারিক বোঝাপড়া, কনভেনশন, আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের রায় প্রভৃতির সমন্বয়েই আন্তর্জাতিক আইন গড়ে ওঠে। প্রতিটি সভ্য-রাষ্ট্র এর উপর গুরুত্ব আরোপ করে। কারণ এই বিধি প্রতিটি সভ্য-রাষ্ট্র নিজের ইচ্ছানুযায়ী গ্রহণ ও লঙ্ঘন করলে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে, নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে। এই কারণে বাধ্য হয়েই প্রতিটি রাষ্ট্রকেই নিজের স্বার্থেই আন্তর্জাতিক আইন মান্য করতে হয়।

জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্যরূপে প্রতিটি রাষ্ট্রকেই সনদে নির্দিষ্ট বাধ্যকতা মেনে চলতে হয়। স্বেচ্ছাকৃতভাবেই কোন রাষ্ট্র সদস্যপদের জন্য আবেদন করে। আবেদন মঞ্জুরের অর্থ হল সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র সনদে বর্ণিত উদ্দেশ্য এবং নীতির প্রতি অনুগত্য প্রকাশ করবে। অনেক সময় সরকার এবং আন্ত:রাষ্ট্রীয় সরকারি সংস্থাগুলি এই সব বে-সরকারি সংস্থার সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করে। অর্থনৈতিক ও সামজিক পরিষদের বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক সংস্থাগুলো এইসব আন্ত:রাষ্ট্রীয় সংস্থার সঙ্গে পরামর্শ করে। আন্ত:রাষ্ট্রীয় বে-সরকারি সংস্থা কোন রাষ্ট্রের সাহায্য ও অনুমোদন ছাড়া কার্য সম্পাদন করতে পারে না। আন্ত:রাষ্ট্রীয় নির্ভরশীলতা বৃদ্ধির ফলে এই সংস্থার প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার দৃষ্টিকোণ তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছে।